উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছোটদের গল্পমালা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম : দশ টাকা

মুদ্রাকর :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ছোটদের গল্পমালা

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায় ?

ছেলেবেলায় একটু একটু একগুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না। অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলেমানুষের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্য লোককে বিরক্ত করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে, তার বইয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বইখানা হস্তে করিয়া, কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোনো জায়গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে, একদিন শুনিলাম ঐ বইখানা আমারও পড়িতে হইবে। আমার আনন্দের সীমা রহিল না; তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাষ্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ হইবে। মাষ্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেনও না—ছবিশূন্য একটা পাত উল্টাইয়া, এ, বি, সি, ডি করিয়া কি বলিতে লাগিলেন! তখন হইতে আর সেই বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভালমানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়িতে তিন বছর থাকিয়া কয়েকখানা বই শেষ করিলাম। তাহার পর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম; কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড়মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশি মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম তাহার একখানিতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর চাই কি! ক্লাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব; আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া

সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটির মধ্যে আঁটে না। তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে: সতীশ বলিল, 'কালই চল।' কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশি দেরি করা হইবে না, সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলাম: সতীশও আসিল। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়ির অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটি পুঁটলি বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ির বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়িতে যাইয়া উঠিলাম।

সেই বাড়ির কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন; আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোনো কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু-একটি কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি; বলিলেন, 'কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব।'

খাইবার সময় ভদ্রলোকটি আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিলেন না। একটি কুঠুরিতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা ভোগ করিলাম; ভাবিলাম কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হইবে না; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বেই কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম, 'সতীশ! সতীশ!'—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে! কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকও তাই; অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।' আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কিপ্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশি হইয়াছিল যে, বাড়ি ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল—যেন বড়লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম, সতীশের মা বাপ আছেন আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর; সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে-সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহার স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি বাড়িতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন আমার ভ্রূক্ষেপ

নাই; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিঁচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাত ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম; এমন সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল; কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয়ত আর বেশি নাই; এইবেলা সতীশকে না বলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনো অনেক ছিল, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; আমিও সেইস্থানে যাইয়া থামিলাম—তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয়ত আরো অনেক দেরি। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙগায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাধিতে লাগিল; নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়ি লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিণামটা প্রথম তত বুঝি নাই, শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক তড়াক করিয়া নৌকাখানিকে দোলাইতে লাগিল, তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, ভয়ানক নদী, আর বাড়ির ছোট কুঠুরীটি—সেই কোমল সুন্দর বিছানাটি মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?

এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেঁউ মেঁউ করিয়া কি বলিতে লাগিল; আমি বুঝিতে পারিলাম

আমাকে গালি দিতেছে; তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশি গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন; তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন নিজ হাতে আমার পুঁটলিটি যত্ন সহকারে এককোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, 'আমি কা—যাইতেছি; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার, আমার বাড়িতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।' আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা--ছোট একটি শহরের মত। অনেক লোক। বড়লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাসবাবু বলিব, তিনিও একজন বড়লোক। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড়লোক হওয়া যায় কি? যায় বইকি। না হইলে ইহারা এত গাড়ি চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড়-লোক হইয়া যাইব। একদিন কালিদাসবাবু ডাকিলেন। কালিদাসবাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন; কিন্তু আমার যেন তখনো শিশু ভাবটা যায় নাই। কালিদাসবাবুও তাহা বেশ বুঝিতেন; যাহা হউক আমি কালিদাসবাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, 'গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?'

'দিব্যি।'

'বটে? তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না?'

'কোথায় যাব? এখানেই থাকব।'

'তা বেশ' বলিয়া কালিদাসবাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটি ছবি। আমার সেই সাহেব! আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেকদিন পরে কোনো পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটি ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল; আমি বলিয়া উঠিলাম, 'আরে!' কালিদাস-বাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাইলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি?

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে ঐ ছবিটে!'

'ইনি একজন বড়লোক ছিলেন; তোমারও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয়, না?'

আমি ভাবিলাম এই বুঝি! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থতমত খাইয়া বলিলাম, 'বড়লোক কি সবাই হয়?'

'হয় বইকি। ইচ্ছে করলে তুমিও হতে পার।'

'আমি পারি?'

'অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন?'

আমার বাতাসের ঘর ভাঙিয়া গেল। যার চোটে বাড়ি ছাড়া সেই আপদ! আমি কোন কথা কহিলাম না।

কালিদাসবাবু এতে সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথাবার্তা কালিদাসবাবুতে আর আমাতে অনেকদিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন : 'সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে!' 'বাড়ি কোথা?' 'মা বাপ নাই?' ইত্যাদি—আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাসবাবুর ইচ্ছা ছিল সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ-সব সম্বন্ধে কোনো খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না। তখন তিনি সে-সব বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোনো মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকা হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না। কা—হইতে দুখানা স্টিমার ধু—তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন স্টিমার চলে। ধু—যাইতে তিনদিন লাগে। হিন্দুরা এই তিনদিনের চিঁড়ে পুঁটলি-বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা স্টিমার এইমাত্র ঘাটে আসিয়া থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ স্টিমারে উঠিয়া ধু—চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, বাড়ি আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড়-চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাস-বাবুর বাড়ি আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহার একটিও ব্যয় হয় নাই। কালিদাসবাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য দু-একটি দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়াছিলাম, বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিস প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙিয়া যায়। আমারও তাই হইল, বড় কামরার ঘড়িতে চারটা বাজিল, আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুঁটুলিটি। পুঁটুলিতে কয়েকখানা কাপড়, একজোড়া চটী-জুতো, নগদ কিছু টাকা, কালিদাসবাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সেগুলি—কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না; তবে কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন, 'লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না।' তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজ-সজ্জা করিয়া, ছাতাটি হাতে করিয়া, বিছানার চাদর-খানা পুঁটুলির উপর জড়াইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম, স্টিমার ঘাটে

আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিঁড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু— পৌঁছিল।

রামলোচনবাবু আমাদের ওদিককার লোক, তিনি ধু—তে থাকেন, সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে তীরে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির একজন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামলোচনবাবুর এই বাড়ি?' সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল; অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচনবাবু! তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশি নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁপগুলি সোজা সোজা, চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কানে একটা কলম, হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে কাহার উদ্দেশে মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম মুছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটি মাটির দোয়াত, তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথার চুলে ঘসিয়া কানে বসাইয়া হাতের দুটি আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটিতে পুঁছিলেন। তার পরক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া 'ভাউ' শব্দে উদ্গার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দী ভাষায় হইল; তাহার পর বাঙলা।

'কি চাই?'

'আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—'

'আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'আমার নিবাস সু—।'

'আমারও নিবাস সু—। তারপর?'

'মহাশয় যদি—'

'ম-হা-শ-য় যদি। কি—ঞ্চি—ৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার

আমার কাছে নাই। হি'য়াসে চলে যাও।'

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচনবাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, 'যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার জায়গা আর খেতে দেবে।' মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দুদিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে খাইলে বেশিদিন পয়সায় কুলাইবে না, এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুঁটুলিটি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ি। এ বাড়ির কর্তা রামলোচনবাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটা অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবামাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাপু?'

আমি।—'আমি পথিক কষ্টে পড়েছি—।'

ইয়ার।—'বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না; ইয়ার-বাবু উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

'হোটেল আছে, হোটেল। বাবুর্চি লোক দিব্যি রাঁধে—রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।'

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম, বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, 'নিজের বাড়িতে একটি লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ি এসে চাবাজো কর। আর আমার বাড়ি এসো না।' বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে; সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার অন্য কোনরূপ কষ্ট না হ'লে আমার বাড়িতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।'

'আজ্ঞে আমি অমনি থাকতে চাই নে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।'

'উত্তম! তুমি ইংরাজি লিখতে পার?'

'কিছু কিছু ইংরাজি পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখা পড়া জানি না।'

'কতদূর পড়েছ?'

আমি বলিলাম।

'বেশ! তাতেই হবে।'

আমি বাবুর বাড়ি রহিলাম। কাজের মধ্যে এই, বাবুর চিঠিপত্র সব একটা নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড়লোক হইবার ত লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড়লোক হওয়া

যায়? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ি যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচা চলিবে না। সুতরাং এবার স্টিমারে যাওয়া হইবে না। বৈ—তীর্থ এখান হইতে বড় বেশি দূরে নয়; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—যাইব; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ি যাইব।

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—আসিতে বড় বেশি দেরি হইল না। জায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটি ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থ স্থান। পাথরের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি; উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যাত্রীরা কোথায় থাকে?' সে বলিল, যাত্রীদের থাকিবার ভাল জায়গা নাই। প্রায় সকলেই পান্ডাদের বাড়িতে থাকে। উপরে যে দেব মন্দির, সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পান্ডা। পান্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পান্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল।

পান্ডার বাড়ি দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধা-জনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের ত কথাই নাই, পান্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠ

ভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পান্ডা আসিয়া বলিলেন, 'দেখিবি? চল্।' আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম; সেটি একটি বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট এক

ঝরনার মত।' পাণ্ডা বলিল, 'এখানে পূজা করিতে হইবে।' কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তা হলে আমার বাড়ি যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম, 'আমি ছেলেমানুষ, পূজা কি করিব?' পাণ্ডা চটিয়া গেল; সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়িতে জায়গা দিল না। অগত্যা আমার সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছুদূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোনো মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ক্ষেপিল। কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে একখানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলাকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা জোড়াটি ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নীচে নামিতে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোনো দোকানে যাইতে হইলে অন্তত এক প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আর এক ঘণ্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু-একটি গাছ দেখিলেই ইচ্ছা হইতেছিল যে সেইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটি বাড়ি খুঁজিয়া লইলাম। বাড়িতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম; সেখানে দুটি ছেলে বসিয়াছিল। আমি তাহাদের নিকটে আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম, তাহারা 'তুই' 'তুই' করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল—

'বাঙালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান; বাঙালী লোককে কিছু দিব না।'

'আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ; চোর নই?'

'যা তুই এখান থেকে : c-r-i-p crip: d-a-s-h dash.'

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরনের কথা কহিতে লাগিলাম :—

'ওর মানে কি হোল?'

'ও ইংরাজি। Ram is ill. I will not let him run in the sun. বাঙালী লোক চোর; যা তুই এখান থেকে।'

'তোরা ইস্কুলে পড়িস?'

এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। বলিল, 'আমাদের মাষ্টার বড় বই পড়ে।'

'তোমাদের মাস্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু? এই দেখ ত!'

আমার পুঁটলিতে যে বইগুলি ছিল, তাহার মধ্যে Lamb's Tales ও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম।

এইবেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। অহাদের মুখভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বুঝা গেল যে তাহারা দুভাই। সে ছোট। বাবা নাই; মা আছেন; ইস্কুলে পড়ে; টাকা আছে, চাকর চাকরানী আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল-খাবারের জন্য কতকগুলি ভিজানো চাল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটি আমার ঘরে বসিয়া আছে। চালগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চাল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটি আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম, সে বলিল, 'মা ব'লে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।'

'তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব, যেন তিনি তোমার ভাল করেন।' তাহাকে বুঝানো কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল, 'তবে যাই, মা'র কাছে বলিগে।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তারপর দুই দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল দু-বেলা খাবার জন্য কোনো মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোনো মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ি যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে 'কড়া' 'বগুণো' সব দেখাইয়া বলিলেন, 'কাল চলে যাবার আগে এইগুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙালী, তোমার এঁটো কে নেবে?' আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, 'ওগুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।' সুতরাং একখানা থালা আর একটি

বগ্‌নো (বগ্‌নোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিলেন; আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আসিলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন, উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় ফা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর ফা—। একই পথ, ভুল হবার জো নাই।'

কিছুদূর হাঁটিয়াই একটা মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটি ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, 'বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সঙ্গীর প্রয়োজন কি?' সে বলিল, 'তুমি আর কখনো এখানে চল নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে!' আমার ভয় হইল।

মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট খসখসের ঝোপ। জীব জন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখি। পাখিটি একটি চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ; ঠোঁট সরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—"টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ।" লেজে একটা নতুনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, 'শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।' অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখিকেই বারবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটি ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিল, 'আজ এখানেই থাকিতে হইবে।' আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'চারটের সময় বসে থাকতে হবে কেন?'

সঙ্গী বলিল, 'মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।' বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেকপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে-সব নাকি হাতির শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই! ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিল।

মাঠ পার হইতে প্রায় চারটা বাজিল। মাঠ যে জায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটি ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেল। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া একটি মাহুতকে পাইলাম, সে হাতি লইয়া ফা—চলিয়াছে। আমি চারি আনা পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতির পিঠে একটু স্থান দিল। মহাসুখে ফা—আসিলাম। কালিদাসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটি মুদীর দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে-সকল ছোটখাট ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একদিনের কথা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল একটা মাঠ; দুই ধারে উলুবন এবং অন্যান্য দুই একটি ছোট ছোট গাছ। এরূপ জায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই! প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুই পাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ী লোক। সে আমাকে কি একরকম ভাষায় বলিল— 'তুই কোথায় যাস? তোর প্রাণের ভয় নাই?' এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সংকেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দুই হাতে উলুবন সরাইয়া শুয়োরের মত দৌড়াইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল 'আরে আয়, মরে যাবি।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম, সেখানে দেখিলাম আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল, যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ও পারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুঁটলি হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল। সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া, নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল 'ঘুমিও না, খেয়ে ফেলবে।' তেমন অবস্থায় ঐরূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে 'ঘ্যাঁওর' 'ঘ্যাঁওর' করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারিপাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনো ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পারে বসিয়া সুখভোগ করিতেছে; সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।

ইহার তিনদিন পরে বাড়ির কাছে বাজারে আসিলাম, সেখানে দই চিঁড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথ কষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দুইটার সময় বাড়ি আসিলাম। তখন বাহির বাটিতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আশে পাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল, উপর্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। ফাঁকি দিয়া বড়লোক হওয়ার স্বপ্নটা ভালরকমেই ভাঙিয়া গেল।

বড়লোক কিসে হয় ?

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায় এই নামের প্রস্তাবটি শেষ করিবার সময় আমরা গিরিশের পরে কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল যে আমরা সে-সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে বেচারা কোন দিনই বড়লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ কষ্টের একশেষ তাহার জীবনে হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশের সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে মোটামুটি সকলগুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সেগুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোন দিন আমাদের সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ গল্পসকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সতর্ক হওয়া ভাল।

বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই কিছু বড়লোক হয় না; তাহা হইলে অত কম লোক বড়লোক হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছা ত সকলেরই আছে, তোমার আমার নাই? কিন্তু আমি যে আজিও ছোট লোকই রহিয়াছি! শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড়লোক হয় না; ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যতটুকু কুলাইয়াছিল সে ত চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও যে সে বড় লোক হইল না? হইবে কেমন করিয়া? কিরূপে কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবে ত সেই গাধা রামকান্তের মতই রহিলাম। রাম ক্লাশে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না, নীচে নামিবারও জায়গা ছিল না। গুরু মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, 'ওরে তোর আর কি কিছু হবে! ভাল ছেলে হ'তে হ'লে তেল পোড়াতে হয়, খাটতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়!' রামকান্ত একদিন বাড়ি আসিয়াই দু সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর ঘরের চালে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপণে দুলিতে লাগিল। সর্বশেষে দড়ি ছিঁড়িয়া আগুনের উপর অর্ধ দগ্ধ, অর্ধ ভগ্ন শরীরে নিষ্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল মাষ্টার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সে সরল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সেদিনই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল। গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড়লোক হই না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড়লোক হইতে ইচ্ছা থাকে— 'নাই' যদি বল তবে আমি হাসিব—তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড়লোক হয়, বেশ করিয়া জান। তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে; তাহার জন্য সমুচিত ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কত জন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে

না। তুমিও পারিবে কি না জানি না—আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে।—কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড়লোক, বড়লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু যতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড়লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে, 'আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'বল ত দেখি লাখ টাকা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?' সে বলিল, 'কেন, লাক টাকা আর লাক টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা।' বড়লোক হওয়া সম্বন্ধেও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোট লোক। ভাই, বড়লোক না হও দুঃখ নাই; কিন্তু ছোট লোক হইও না।

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড়লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়লোক, লর্ড রিপন বড়লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড়লোক সুরেন্দ্র বাবু বড়লোক ইত্যাদি ইঁহাদের সকলেই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে ইঁহাদের যাঁহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড়লোক বলা হয়। বড় চোরকেও বড়লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকেও বড়লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলি না। মহেন্দ্র বাবু নিজের ঘরে কবাট দিয়া বিজ্ঞান চর্চা করিলে আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলিতাম না, অন্তত তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন, ইঁহারা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিছুই বা জানেন না তাহার হিসাবও হয়ত আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্র বাবুর স্কুল আছে সেখানে তিনি পড়ান এজন্য তাঁহাকে কেহ বড়লোক বলে না। যিনি যে পরিমাণে লোকের উপকার করিতেছেন তিনি সেই পরিমাণে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড়লোক এবং ভাল লোক, এ উভয় হইলেই যথার্থ বড়লোক। বড়লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়। এবং তাহাই আগে হওয়া উচিত। কাহারো যদি এক কোটি টাকা থাকে তাঁহাকে সুধু ঐ টাকাগুলির জন্য বড়-লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্‌গুণের সাহায্যে উহা উপার্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড়লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখিব তিনি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে যথার্থ বড়লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড়লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড়লোক বড়, ভাল লোক ভাল, বড়লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

বানর রাজপুত্র

এক রাজার সাত রানী, কিন্তু ছেলেপিলে একটিও নেই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ; তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা কন না।

একদিন হয়েছে কি—এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা, তোমার মুখ যে ভার দেখছি; তোমার কিসের দুঃখ?'

রাজা বললেন, 'সে কথা আর কি বলব, মুনি-ঠাকুর! আমার রাজ্য, ধন, লোকজন সবই আছে, কিন্তু আমার যে ছেলেপিলে নেই, আমি মরলে এ-সব কে দেখবে?'

মুনি বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা, তোমার কোন চিন্তা নেই। কাল ভোরে উঠেই তুমি সোজাসুজি উত্তর দিকে চলে যাবে। অনেক দূর গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আমগাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে তোমার সাত রানীকে বেটে খাইয়ে দিলেই, তোমার সাতটি ছেলে হবে।, কিন্তু খবরদার, আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন!'

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তারপর দিন গেল, রাত হল, ক্রমে রাত ভোর হল। তখন রাজামশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আমগাছ আছে, তাতে পাকা পাকা সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কতবার শিকার করতে এসেছেন, কিন্তু আমগাছ কখনো দেখতে পান নি। যা হোক, তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি পেড়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরে চললেন।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই শুনলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

ওগো রাজা, ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না। তিনি
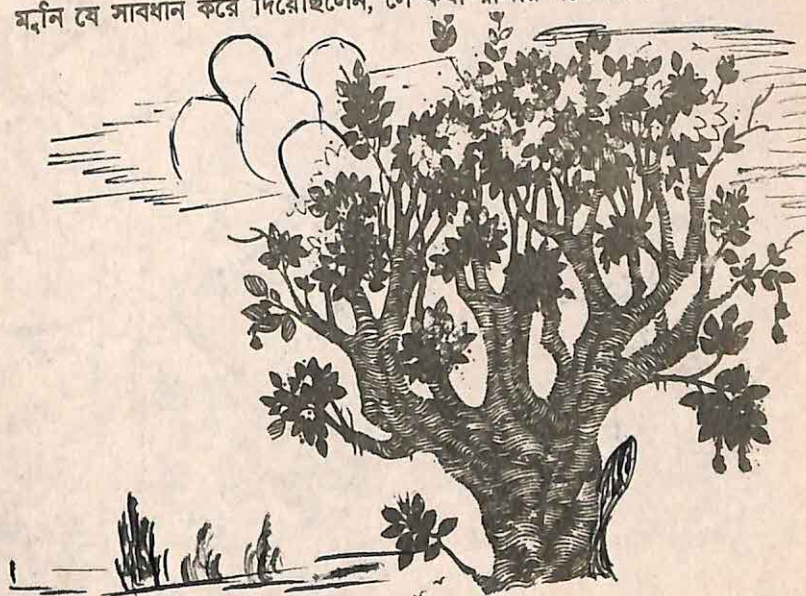
পিছন থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে। কাজেই রাজামশাই-এর আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হল। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসব্যর সময় পিছন থেকে তাঁকে কতরকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর' 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজামশাই তাতে কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ি পানে ছুটলেন।

বাড়ি এসে রানীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে রাজামশাই বললেন, 'তোমরা সাতজনে এই সাতটি আম বেটে খাও।'

ছোটরানী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রানীরা ছজনে মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেললেন। ছোটরানী এর কিছুই জানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রানীদের খাওয়া হয়ে গেলে সে আমের ছালগুলি চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে বেটে ছোটরানীর হাতে দিয়ে বলল, 'মা, এই ওষুধটা খাও, তোমার ভাল হবে।' ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোটরানী আর কোন কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেললেন।

তারপর বড় রানীদের সকলেরই এক-একটি সুন্দর খোকা হল, রাজা তাতে খুশি হয়ে খুব ধুমধাম আর গানবাজনা করালেন। ছোটরানীরও একটি খোকা হল, কিন্তু সেটি হল বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে ছোটরানীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হল। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোটরানীকে বলল, 'মা, তুমি এইখানে থাকো।'

সেইখানে ছোটরানী থাকেন। বানরটি সেখানে থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের মত কথা কয়। আর তার এমনি বুদ্ধি যে, কোন কথা তাকে

শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়; খুব ভাল লাগলে মার জন্যে নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর গাছের ফল খেতে গেলে সে ভারি খুশি হয়ে ভাল ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়!

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রানীদের ছটি ছেলেও এখন বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যার পর নাই হিংসা করে, সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর একদিন বানরটি দেখল, যে বড় রানীদের ছেলেদের জন্য মাস্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে পুঁথি এনে দাও, আমি পড়ব।'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায় বাছা, কি করে পড়বে? তুমি যে বানর।'

বানর বলল, 'সত্যি মা, আমি পড়ব; তুমি বই এনে দিয়েই দেখো। তুমি আমাকে পড়াবে।'

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেলে। সে দু বছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রানীদের ছেলেরা তখনো দু-তিনখানি বই-পুঁথি শেষ করতে পারে নি; রোজ খালি মাস্টারের বকুনি খায়।

এ-সব কথা শুনে রাজা একদিন বললেন, 'বটে? বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এসো ত তাকে, আমি দেখব।'

বানরের কিছুতেই ভয় নেই; রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোটরানীকে কুঁড়েঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়িতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রানীরা কিছু বলেন। তাই তিনি ছোটরানীকে রাজবাড়ির পাশেই একটি খুব সুন্দর বাড়ি করে দিলেন। সেই বাড়িতে তখন থেকে ছোটরানী তাঁর বানর নিয়ে থাকেন। টাকা-কড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায়। লোকে তাঁর বাড়িটাকে বলে বানরের বাড়ি। এ-সব দেখে বড় রানীদের ছেলেরা বানরকে আরো বেশি হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বলল, 'রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এঁদের বিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তাদের দেশ বিদেশ ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে, নানানরকম শিখে, টুকটুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আনুক।'

সকলে বলল, 'বেশ বেশ! তাই হোক।'

তারপর ছয় রাজপুত্র সেজেগুজে, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নানান দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমিও যাব।'

তার মা বললেন, 'তুমি কি করতে যাবে জাদু, তোমাকে কোন্ টুকটুকে

রাজকন্যা বিয়ে করবে?'

মা বললেন, 'তুমি যে দেশ দেখতে পাবে, আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব?'

বানর বলল, 'আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে যেতে দাও।'

কাজেই ছোটরানী আর কি করেন? বানরকে যেতে দিতেই হল।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে; রাজবাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথে চলতে চলতে তাদের নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বানর বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আমিও এসেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

তাতে রাজপুত্ররা যার পর নাই রেগে বলল, 'বটে রে, তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি বলে তুইও তাই করতে যাবি! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা বানরকে মারতে মারতে আধমরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেই বনে ছিল একদল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয়জন রাজপুত্র ভারি সাজ করে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই ত তারা মার-মার করে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড়সড়, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকাকড়ি, ঘোড়া, পোশাক— সবসুদ্ধ তাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু মিনিটও লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চলল। বানর যেন তাতে বেশ খুশি হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতেরা ভাবল, বুঝি কারু পোষা বানর, কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

সেই বনের ভিতরেই ডাকাতদের ঘর। সেদিন তাদের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধনসুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তারা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে, তখন বানর চুপিচুপি তার নিজের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন্ লাজে? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিসপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল, ডাকাতেরা কিছু টের পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থামল না। সকালে তারা দেখল যে তারা ভারি চমৎকার একটা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেন একটা ঝকঝকে সাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ির কাছে গিয়েই টকটক করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দরোয়ানেরা তাদের পোশাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম করল, আর কিছু বলল না। বানর কিন্তু জানে যে, সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে; তাই সে রাজবাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে, খিড়কির পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।

সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রানী। তাদের বড় ছজন ছিল ভারি হিংসুক আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মত সুন্দর আর বড় লক্ষ্মী। বড়রা রাজাকে মিছামিছি নানান কথা বলে, ছোটরানীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; তিনি খিড়কির পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতরে থাকতেন, রাজা তাঁর কোন খবরও নিতেন না। বড় ছয় রানীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখতে ছিল ঠিক তাদের মায়ের মতন, আর তাদের মনও ছিল তেমনি। আর ছোটরানীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মার মত—তেমনি সুন্দর, তেমনি লক্ষ্মী। তা হলে কি হয়, বড় রানীরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ছোটরানীর মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কানা, খোঁড়া, কালা আর বোবা।

সেই খিড়কির পুকুরের ধারে, সেই ছোটরানীর কুঁড়েঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রানীদের ছয় মেয়ে ছটি ঘটি নিয়ে সেখানে স্নান করতে এল, ছোটরানীর মেয়েটিও তার ছোট্ট ঘটিটি নিয়ে এল। তারা স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েটির ঘটি থেকে কেমন করে খানিকটা জল বানরের গায়ে পড়ে গেল। অমনি বড় রানীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওমা! ওমা! তোমরা দেখো এসে—ছোটরানীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে!'

বড় রানীরাও তা শুনে ছুটে এসে বলতে লাগল, 'তাই ত, তাই ত। ছোটরানীর মেয়ে বানরটাকে বিয়ে করেছে!'

সেই খবর তখনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজার সভায় বসে শুনল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোটরানীর মনে যে কি কষ্ট হল, তা আর কি বলব? তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোড় করে বলল, 'মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন; এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে রানী উঠে বসলেন। তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই থেকে বানর তাঁর ঘরের কাছে গাছের ওপরে থাকে আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। রানী যখন শুনলেন যে, সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর, সে কথা তিনি ভুলে গেলেন; তাঁর মনে হল যে এমন ভাল আর বুদ্ধিমান লোক আর মানুষের ভিতরে নাই।

এদিকে হয়েছে কি, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়িতে ঢুকে একেবারে তাঁর সভায় এসে হাজির হয়েছে; রাজা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপু, তোমরা কে? কি করতে এসেছ?' তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুনলেন, আর শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্য রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন ত আর তাঁর খুশির সীমাই রইল না। তিনি বললেন, 'বাঃ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে! বেশ হল; আমার ছয় মেয়েকে তোমরা ছজনে বিয়ে করবে।'

ঠিক এমনি সময় বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্ররাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরই বাঁদর। তাদের মনে হিংসাটা যে হল! বাঁদর এসে তাদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেলল, লোকে আবার কানাকানি করে বলে যে সে মেয়ে নাকি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর আর ভাল— এ-সব কথা তারা যত ভাবে ততই খালি হিংসায় জ্বলে মরে।

যা হোক, রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে ত তাদের ছয় জনের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর ঝকঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তারা বউ নিয়ে দেশে চলল। বানরও একটি ছোট নৌকায় করে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভূত হয়ে গেছে আর ভেবেছে যে একে বউ নিয়ে দেশে পৌঁছতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই, ভাই' বলে ভারি আদর দেখাতে লাগল, যেন তাকে কতই ভালবাসে। শেষে যখন বাড়ির কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস ছোট বউ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে কোনমতে ডাঙায় উঠল, নইলে সে যাত্রা আর উপায়ই ছিল না।

তারপর সকালবেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগল, রাজা খবর পেয়ে ছেলে-বউদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বানর কই?' তারা বলল, 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে।'

বানর ত মরে নি, সে নদীর ধারে ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওরা 'সে জলে ডুবে মারা গেছে' বলতেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আমি মরি নি বাবা, ওরা আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি।'

তখন ত রাজপুত্রদের মুখ চুন। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বললেন, 'বটে! তোদের এই কাজ? দূর হ তোরা আমার দেশ থেকে; আর তোদের মুখ দেখব না।'

এই বলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা যার পর নাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর এমন সুন্দর লক্ষ্মী বউ ঘরে এনে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

তারপর খুব সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কি, বউমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায়; রাত্রে সে বানরের ছাল খুলে ফেলে দেবতার মত সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোটরানীকে বললেন, ছোটরানী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা ত শুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে এসে বললেন, 'বউমা, তুমি এক কাজ করো। আজ রাত্রে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটাকে পুড়িয়ে ফেলবে।'

সেদিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জেবলে রাখা হল, বানর তা জানতে পেল না। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে অমনি রাজকন্যা চুপিচুপি নিয়ে সেটাকে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে বানর উঠে দেখে তার ছাল নেই। তখন সে ত ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হল, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কি হবে, আর বানর হবার জো নেই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, আর ছেলেবুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব দেখেশুনে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

পাকা ফলার

পাড়াগাঁয়ে এক ফলারে বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই খুব গরিব; দৈ-চিঁড়ের বেশি কিছু খাইতে দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল দৈ-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এরপর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল, 'পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।' সে বেচারা গরিব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, 'মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ? রাজা রাজড়া হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, 'তবে, রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।'

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, রাজার বাড়িটা কোন্‌খানটায়?' একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'ঐ যে পাকা বাড়ি দেখছ, ঐটে রাজার বাড়ি।'

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং, 'পাকা বাড়ি'র কথা শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেরই কুঁড়েঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, 'পাকা বাড়ি! আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!'

এ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই 'উঃ-হুঃ-হুঃ' করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, 'তাই ত, এই পাকা ফলারের এত নাম!' খানিক ভাবিয়া সে বলিল, 'ওঃ হো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কি! ওটা ওর খোলা; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে!' এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙিয়া গেল, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, 'আর বেশি দেরি নেই; এরপরই পাকা ফলার আসবে!' এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়িওয়ালা এক দরোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 'আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডাল্‌তে হো? চলো তুম হমারে সাথ।' এই বলিয়া দরোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দরোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'কি ঠাকুর, ওখানে কি করছিলে?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম।

খোলাটা না ভাঙতে ভাঙতেই এই বেটা দরোয়ান আমাকে ধ'রে এনেছে!'

এই কথা শুনিয়া রাজামহাশয় হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি। যাহা হউক, তাহার সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজামহাশয়কে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজামহাশয়, মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি! পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হল; কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল!'

ময়দা আর ঘি দিয়া যে লুচি তৈয়ার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া, আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালই লাগিয়াছিল; তবে, পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ!

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাঁহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে, তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের ক'রে, এই ঠাকুরকে পেট ভ'রে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।'

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'আমি খাবার তয়ের ক'রে রাখব, বিকালে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে এখন।' ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ি গিয়া বিকাল বেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তয়ের করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, 'সেই লোকটি এলে তাকে বেশ ক'রে খাওয়াস!' তাহার ছেলে বলিল, 'তার জন্যে কিছু চিন্তা করো না, আমি তাকে খুব যত্ন ক'রে খাওয়াব এখন।' রসুয়ে বামুন রাজবাড়িতে রান্না করিতে চলিয়া গেল; আর তাহার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু সেরের বেশি লুচি আর তাহার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খানচারেক লুচি আর খানিকটা তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে

দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি—রাজার বামুন ঠাকুর যাহা তয়ের করিয়াছে! এমন জিনিস দু-চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট ত ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

রসুয়ে বামুনের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফলারে বামুন রাস্তা দিয়া চলিল। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা দেখিতেছে না। চলে, আর খালি বলে, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

এমন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভান্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে বামুনের জন্য পুরো দু সের ময়দা আর তাহার মতন অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামুনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুরমশাই! কি যদি আর খানকতক দিত?' ফলারে বামুন বলিল, 'বাবা আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি যদি আর খানকতক হত!'

ভান্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে কখানা দিয়েছিল?' ফলারে বামুন বলিল, 'চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল।' ভান্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! দু সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'হাঁ বাপু, চারখানাই ছিল। আর তাতে খুব চমৎকার লেগেছিল।' ভান্ডারী বলিল, 'দু সের ময়দায় তার চেয়ে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'তাই নাকি? বাপু তুমি বেঁচে থাকো। হতভাগা, বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান, পাজি'—বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্য ভান্ডারীকে দেয় নাই—রসুয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই, তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল, 'বন্ধু, ঢের লুচি তয়ের ক'রে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শিগ্‌গির যাও; আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।'

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুশকিলে পড়িল। লুকাইবারও স্থান নাই, পলাইবারও পথ নাই। এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার কোণে একটা কাঠের খাম জড়াইয়া কোনরকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে বামুন নিতান্তই সাদাসিধে লোক, লুচি খাইবার জন্য তাহার মনটা যার পর নাই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে বামুন সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি মিঠাই সাজানো দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরিল, তত সে খাইল; আর একটি হজমি গুলির স্থানও নাই।

এমন সময়ে ভারি একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্যদিন সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে?' রসুয়ে বামুন বলিল, 'ঝাঁজরা ফেলে গিয়েছিলুম, তাই নিতে এসেছি।'

এতক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হইয়াছে যে, আর-একটু হইলেই তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে 'জল জল' বলিয়া চেঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে বলিল, 'ওটা কি রে?' ছেলে দেখিল ভারি মুশকিল। সে ফলারে বামুনের কথা ত আর জানিত না, কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া বিশ্রী স্বরে জল
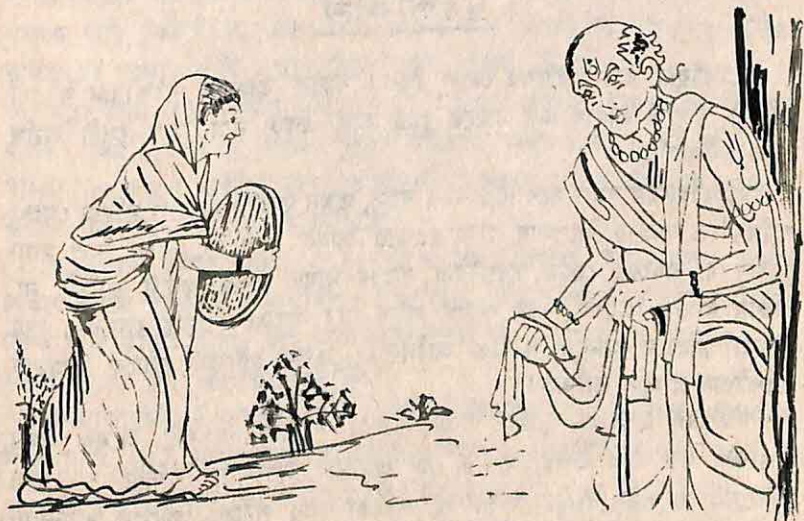
চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাড় আস্ত রাখিবে না, আর কিছু না বলিলেও হয়ত এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে। এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি জোগাইল—সে বলিল, 'বাবা, ওটা, নিশ্চয় ভূত। তা নইলে মাচার থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন।'

ভূতের কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরো মুশকিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয় ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কি করে তাহার ঠিক কি? ছেলের ভারি ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল, 'তা হবে না, যদি তোর ঘাড় ভেঙে দেয়।' এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপর কয়েকটা নারকেল ছাড়ানো আছে, সুতরাং; সে ভূতকে বলিল, 'মাচায় নারকেল আছে, থামে আছড়ে ভেঙে খাও।'

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নারকেলগুলি ছিল; সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। সে থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়া ছিল; ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে—একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় আর কি!

এরপর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিল; আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণও হাঁউমাঁউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হইল। আসল কথাটা জানিতে এরপর আর বেশি দেরি হইল না। চোর ধরা পড়িল, আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙান ঠেঙাইল যে কি বলিব!

দুঃখীরাম

দুঃখীরাম খুব গরীবের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল—সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দু বছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোন খবরই লইল না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরীবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? অন্য ছেলেদের ফেলিয়া-দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম

শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার একজন মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে, একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই ত, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা ত জান না। আমরা যে দু মাসে একদিন খাই! কাল খেয়েছি, আবার দু মাস পরে খাব।'

দুঃখীরাম বলিল; 'মামা, তার জন্য ভাবনা কি? তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছুই বলিল না; দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাত ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাত ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখীরামেরও খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশি সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশও হইল না। সন্ধ্যার সময় সে কেষ্টকে বলিল, 'মামা, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারি খুশি হইল, আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমোয় নাই—মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এরপর মামা কি করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল, দাদা ঘুমাইয়াছে। এর একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, এবারে মামা উঠিয়াছে। তারপর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধোয়ার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ—সকলই শুনা গেল। দুঃখী-রামের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপিচুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল, কেষ্ট পায়স রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে, পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে দুঃখীরাম, কি হইয়াছে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কি করছিলে, আর একজন লোক বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই সে লাঠি হাতে ঘরের পেছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা শিগ্‌গির ওঠো, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথায়ও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির

ভগ্নীর বাড়ি, হয়ত হঠাৎ তাহার কোন ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে ত ধরিতে পারেই নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তুমিও গেলে আর যে লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল; আর দাদাও তখ্খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয় পাড়ার দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, আর সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল যে, এর মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়সের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তার উপর আরার তার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে দেখিতে সেই পায়সের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তারপর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া, শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে—পায়সের হাঁড়ি খালি! তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায়, আর একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামেরই কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপ-বেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে তুই এমন কাজ কেন করলি? ওদের পায়স চুরি করে কেন খেলি?—আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি।'

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার! ওঁরা দুমাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়স রাঁধলেন কেন? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন? তা আমি ত সত্যি কথাই বলেছি, তাতে যদি ওঁরা খামকা নাকাল হতে গেলেন, তা আমার কি দোষ।'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা

ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক-চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকুরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোট মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটা বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কি করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড় মন্ত্রীর বন্ধুতা ছিল। সেই সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষিরাজ ঘোড়া মানুষের মত কথা কহিতে পারে, শূন্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে, আর ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রী-মহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, 'আচ্ছা বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয় ত কি হইবে?' মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে জিনিসটাতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি তোমার কথা সত্য না হয়?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কি হইল তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে, আর পক্ষিরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে একটা উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয়ের একটু বসিবার দেরি সয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কি হইল?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন; সওদাগরও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া এক টান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কি বন্ধু! আপনার মতন লোকের ঐ সামান্য দড়িগাছটায় লোভ! একটা কোন দামী জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে, ছোট মন্ত্রী ছাড়া এ আর কাহারো কর্ম নয়, তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় গিয়া জোড়হাতে তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বড় মন্ত্রী?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষিরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আরো বিনয় করিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন, 'মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোট মন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেন।' রাজা বলিলেন, 'সে কিরকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আমি আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।'

রাজাদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিশ দিতেন ত অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন ত মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিত না, সুখে

ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে, 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপিচুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাল লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর এক টুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কি দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকেও রাখবে না, আমাদেরও রাখবে না।'

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরনার ধারে গাছতলায় এক বুড়ি ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনো দেখে নাই। বুড়িকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল, যে একটা বিষাক্ত সাপ চুপিচুপি সেই বুড়ির দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরনার জলে ফেলিয়া দিল। কি আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবামাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ি খানিক অবাক হইয়া ঝরনার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম।' বুড়ি বলিল, 'বাবা, তুমি কি চাও?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি কিছু চাই না। তুমি বুড়োমানুষ, বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তু-টন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ি বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবে না, সুতরাং বুড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে

এক বর দিয়া যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ-সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রী হইবে, তবে তাঁহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ-সকল কথা ভাবিয়া বেচারী মনটা একটু দুঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়া ছিল তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভাল নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ মুল্লুকে গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল!'

যেই এ কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল, যেখানে ভয়ানক বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধু ধু করিতে লাগিল। কি সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কি করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপনমনে খালি হাঁটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরো বেশি হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকান্ড কুড়াল; সে যে-সে কুড়াল নয়, জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারি হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মত ভারি ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি আর পারি না, অত ভারি কুড়ালের হাত-পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতন তাহার সব পা হইল; আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরো গোল লাগিয়া গেল। সে একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, হইল কি!

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত। প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে; সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ঐরকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কি কর? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কি করে? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দরোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পাসুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত! 'হায় বাপ' বলিয়া চারি হাত-পা ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দরোয়ানজী

আপনি এক লাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দরোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে ফেলিয়া, ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দুজনেই তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু-পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানীরাও তাহাই করিতেছে—পুলিস-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় সকল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাত ভাই কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতর ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনো হাঁটে? এ নিশ্চয় কোন জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে।' রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী, এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও, উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মত দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কি ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পাও নাড়িতে পারিল না; বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইল খানেক টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল।

দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এরপর কি হয়। স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যের বেলা বলা খুব সহজ; তোমাকে একবার ওরকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটা পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে চিত করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখী-রামের মতন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন; কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুটো ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঠিক দুঃখীরামের মতন বাঁধা হইয়াছে কি না। যখন দেখিল যে দুজনকেই ঠিক একরকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই-সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজামহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে-সকল পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে মাঝখানে রাজামহাশয় উঠিয়া গেলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখী-রামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কি বলিব! অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা ভাবেন না; কিন্তু ক্ষুধা ত কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রী-মহাশয়, সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'আহা, ও-সব জিনিস যদি আমাকে কেহ এখন আনিয়া দিত!'

রাজামহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে শত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাসুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল! মন্ত্রী-মহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ হইতে না হইতেই তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না; তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল,

'হায় রে, হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে এক লাফে উঠিয়া বসিয়া দু হাতে লুচি, মাংস, পোলাও, পায়স, মেঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর পালাবে।' আর-একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে, একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, 'আহা, খাক্ খাক্!' দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল; দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরো হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মত বেশভূষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কি করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা ত সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে এক-ঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু হাতে সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যার পর নাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল 'সর্বনাশটা যে কি করলে তা ত বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দু হাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। ক্রমে দেখা গেল যে যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস, কেহ পাইক, কেহ দরোয়ান, কেহ দোকানী, কেহ ভিখারি।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারো ইচ্ছা নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, 'মন্ত্রী-মহাশয়, অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার

প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই সুন্দর চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল-হাতে, কালো ভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড়হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কি না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ, আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথার তিনি আর কি উত্তর দিবেন! কেবল বলিলেন, 'আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব করো।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর-সকলের কি হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে
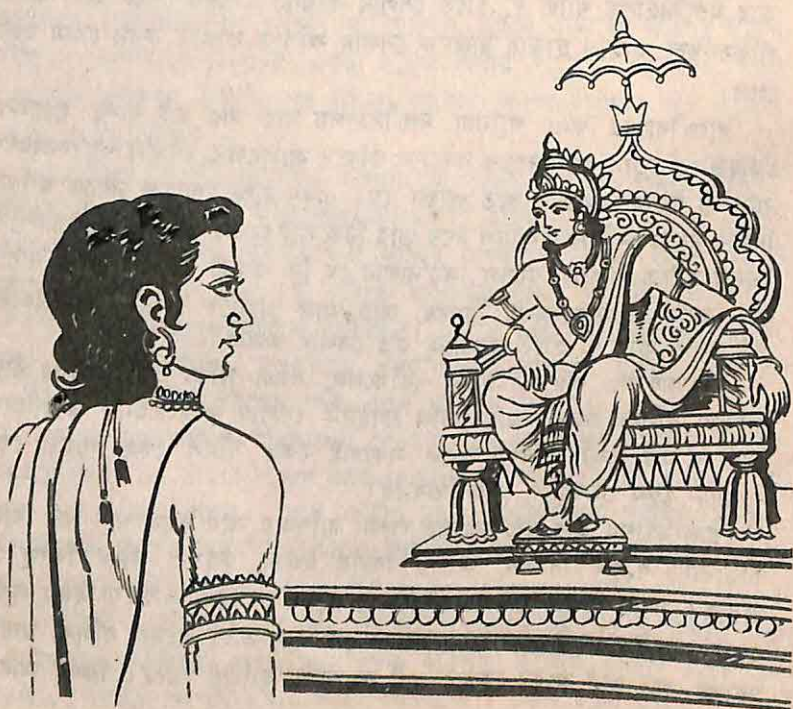
নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এক নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে. কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক।'

ঠাকুরদা

এক গ্রামে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তারা তাঁকে বলত ঠাকুরদা। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশসুদ্ধ লোকেও তাঁকে ঐ নামেই ডাকত।

ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেত, আর তাঁকে জ্বালাতন করত তার চেয়েও বেশি। ঠাকুরদা ভারি পন্ডিত আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তাঁর একটু পাগলামি ছিল; পেয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা সে কথা খুবই জানত আর তা নিয়ে ভারি মজা করত।

ঠাকুরদা রোজ তাঁর চন্ডীমন্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক-একটা দুষ্টু ছেলে দাড়ি পরে, লাল পাগড়ি এ'টে, মালকোচ্চা মেরে লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত, 'ভওয়ানী ভটচাজ কোন হ্যায়?' ঠাকুরদা তাতে বিষম থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়েই যদি লাল পাগড়ির খানিকটা দেখতে পেতেন, তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায়, সে কথার খবর নেবার অবসর তাঁর থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন। ছেলেরা বলে যে, তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হত। কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

যা হোক, এমন বিষম ভয়ের কান্ডটা যে ছেলেদের কাজ, এ কথা মুহূর্তের তরেও ঠাকুরদার মাথায় আসত না। তিনি ছেলেগুলিকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসতেন। তাঁর কুলগাছটিতে কুল পাকলে তাদের সকলকে ডেকে ডেকে একটি-একটি করে কুল প্রত্যেকের হাতে দিতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না—একটির বেশিও কখন কাউকে দিতেন না। সেই পরগনার ভিতরে এমন মিষ্টি কুল আর কোথাও ছিল না। কাজেই, একটি খেয়ে ছেলেদের যেমন ভাল লাগত, আর খেতে না পেয়ে তাদের অমনি কষ্ট হত।

তবুও এমন কথা শোনা যায় নি যে, ঠাকুরদার দেওয়া ছাড়া আর-একটি কুল কেউ কখনো তাঁর গাছ থেকে খেতে পেরেছে। তাঁর চন্ডীমন্ডপ থেকে সেই কুল গাছটি পরিষ্কার দেখা যেত। সেদিকে কাউকে যেতে দেখলেই তিনি 'কে-রে এ-এ' বলে এমনি বিষম হাঁক দিতেন যে কি বলব! তখন আর হাত

পা সামলে ছুট দেবারও উপায় থাকত না। দু মাইল দূরে থেকে লোকে বলত, ‘ঐ রে! ঠাকুরদা তাঁর কুল আগলাচ্ছেন।’

খালি একবার ছেলেরা ঠাকুরদার কাছ থেকে একপোয়া সন্দেশ আদায় করেছিল। ঠাকুরদা চন্ডীমন্ডপের সামনে বসে একমনে পুঁথি লিখছিলেন; তিনি দেখতে পান নি যে, এর মধ্যে ও পাড়ার বোসেদের বানরটা কেমন করে ছুটে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, আর তার পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো বাঁধানো হুঁকোটি নিয়ে গাছে উঠেছে। তারপর তামাক খেতে গিয়ে দেখেন, কি সর্বনাশ! বানরটাকে তিনি কত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কত লম্বা লম্বা সংস্কৃত বকুনি বকলেন, কিছুতেই তার কাছ থেকে হুঁকোটি আদায় করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে সে বেটা তাঁকে গোটা দশেক ভেংচি মেরে হুঁকো-সুদ্ধ পাশের বাড়ির আমবাগানে চলে গেল।

সেদিন ছেলেরা না থাকলে ঠাকুরদার আবার তাঁর হুঁকোর মুখ দেখবার কোনো আশাই ছিল না। তিনি তাদের সন্দেশ কবুল করে অনেক কষ্টে তাদের দিয়ে বানরের হাত থেকে হুঁকোটি আদায় করালেন। তার পরদিনই নিজে গিয়ে বেচু ময়রার দোকান থেকে তাদের জন্যে এক পোয়া সন্দেশ কিনে আনলেন। সে সন্দেশ খেয়ে নাকি তারা মুখ সিঁটকিয়েছিল। ঠাকুরদা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, ‘সন্দেশটা বড্ড মিষ্টি।’ ঠাকুরদা তখন খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, ‘তাই ত আমি জানতুম না তোমরা তেতো সন্দেশ খাও। আমি মিষ্টি সন্দেশই কিনে এনেছি।’

পয়সা খরচ নিয়ে কিন্তু ঠাকুরদার একটু বদনাম ছিল। ঐ যে হুঁকোর খাতিরে ছেলেদের একপোয়া সন্দেশ কিনে খাইয়েছিলেন, তা ছাড়া আর তাঁর জীবনে তিনি কখনো কাউকে কিছু কিনে খাওয়ান নি। লোকে বলত তাঁর ঘরের ভিতরে তিন-জালা টাকা পোঁতা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এমনভাবে চলতেন যেন অনেক কষ্টে তাঁর দুটি খাবার জোটে, সেও বুঝি-বা একবেলা বই দুবেলা নয়। একদিন দিদিমা ডাল রাঁধতে গিয়ে তাতে একটু বেশি ঘি দিয়ে ফেলেছিলেন; সেই অপরাধে নাকি ঠাকুরদা দুমাস তাঁর সঙ্গে কথা কন নি।

ছেলেরা তাঁর সেই সন্দেশ খেয়ে অবধি তাঁর উপর একটু চটে ছিল। না চটবেই বা কেন? সেই হতভাগা বানরটার কাছ থেকে হুঁকো আদায় করতে গিয়ে কি তারা কম নাকাল হয়েছিল? কুড়ি জন মিলে তিনটি ঘণ্টা ধরে তারা সেদিন কত গাছই বেয়েছে, কত ছুটোছুটিই করেছে, কত কাদাই লাগিয়েছে, কত বিছুটির ছ্যাঁকাই খেয়েছে। তার পুরস্কার হল কিনা অমনিতর একপোয়া সন্দেশ!

তখন ছিল পুজোর সময়। কুমোরদের বাড়িতে অনেক ঠাকুর গড়া হচ্ছিল, তার তামাশা দেখবার জন্যে সকালে বিকালে ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে যেত। সেইখানে তাদের একটা মস্ত মিটিং হল; ঠাকুরদাকে জব্দ করতে হবে। তিনি যেমন সন্দেশ খাইয়েছেন, তাঁকে দিয়ে কিছু বেশি হাতে টাকা খরচ করাতে পারলে তবে তার দুঃখটা মেটে। কিন্তু এমন লোকের পয়সা ত সহজে

খরচ করানো যেতে পারে না; তার কি উপায় হতে পারে।

কতজনে কত কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, 'চল ঠাকুরদার কুলগাছ কেটে ফেলি।' কেউ বলল, 'তাঁর হুঁকো লুকিয়ে রাখি।' কিন্তু এ-সব কথা কারুর পছন্দ হল না। এমন কুলগাছটি কাটলে ভারি অন্যায় হবে। হুঁকো লুকিয়ে রাখলেও ত শেষটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-সব করলে তাঁকে আর টাকা খরচ করানো হল কই? ঠাকুরদাকে ছেলেরা আসলে ভালবাসত, নাহক তাঁর লোকসান করাতে কারো ইচ্ছা ছিল না। কাজেই এ-সব কথায় সকলের অমত হল। এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে হবে যে সেটা তাঁর ক্ষতির মধ্যে ধরা না যেতে পারে।

ছেলেরা দেখল কাজটি তেমন সোজা নয়। বুড়ো কুমোর এর মধ্যে এসে বুদ্ধি জুগিয়ে না দিলে তাদের পক্ষে এর একটা মতলব ঠিক করাই ভার হত। বুড়ো যে যুক্তি বলল, সে ভারি চমৎকার। ছেলেরা তার কথায় যার পর নাই খুশি হয়ে ঘরে চলে গেল। ঠিক হল, পরদিনই সেই কাজটি করতে হবে।

রাত থাকতেই ঠাকুরদার ঘুম ভাঙে। তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সুর ধরে শোলোক আওড়ান। তারপর ভোর হবার একটু আগে উঠে, স্নান তর্পণ সেরে, শেষে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসেন। সেদিনও দোয়েল ডাকবার আগেই তিনি জেগে সবে বলেছেন, 'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী'—অমনি বাইরে কে যেন ডাকল, 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ ঘরমে হ্যায়?'

আর ঠাকুরদার শোলোক আওড়ানো হল না। স্নান আহ্নিক আজ তিনি খিড়কির পুকুরেই সারলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লেখার কাজটিও আজ বন্ধ রইল—তার চেয়ে দিদিমার রান্নাবান্নার খবর নেওয়াই বেশি দরকার মনে হয়েছে। এমনি ভাবে দুপুর অবধি কেটে গেল। এরপর যখন আর কেউ 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ' বলে ডাকল না, তখন ঠাকুরদা সাহস পেয়ে ভাবলেন, একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না কেন!

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরে এসে ঠাকুরদা দেখলেন—কি সর্বনাশ! কি চমৎকার! তাঁর মণ্ডপের মাঝখানে দুর্গা প্রতিমা ঘর আলো করে বসে আছেন। ঠাকুরদার আর পা সরল না। তিনি সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলেন—হায়, হায়! কোন্ শয়তান এমন কাজ করল! এই প্রতিমা আমার ঘরে রেখে গেছে, এখন একে পুজো না করলে মহাপাপ হবে। আর পুজো করতে গেলেও যে তিনশোটি টাকা'র কম লাগবে না। বাবা গো, আমি কোথায় যাব!

যা হোক, ঠাকুরদা কৃপণ হলেও অতি ধার্মিক আর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তখনই ভাবলেন—আর দুঃখ করে কি হবে? ঘরে টাকা রেখেও আমি দেব সেবায় হেলা করেছিলাম, তাই দেবতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভালোই হল, এখন থেকে আমি ফি-বছর দুর্গোৎসব করব।

ততক্ষণে ছেলেদের দুটি একটি করে প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজটি ত তাদেরই, তারাই ঠাকুরদাকে পেয়াদার ভয় দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে সেই অবসরে প্রতিমাটিকে এনে মণ্ডপের ভিতরে রেখে

গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে ঠাকুরদারও আর সে কথা বুঝতে বাকি রইল না। তখন তিনি বললেন, 'ভালই করেছ দাদা, বুড়ো পাপীর সুমতি জন্মিয়ে দিয়েছ। তোমরা বেঁচে থাকো। আমি খালি ভাবছি—এত বড় ব্যাপার, আমার লোকজন কিছু নেই, আমি কুলোব কি করে?'

ছেলেরা ভেবেছিল, ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করবেন। তার বদলে তিনি এমন কথা বলবেন, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তাতে ভারি খুশি হয়ে বলল, 'তার জন্যে চিন্তা কি ঠাকুরদা? আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে হুকুম দিন।' অমনি ঠাকুরদার মুখ ভরে হাসি ফুটে উঠল, তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। ছেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে, গাল টিপে আর নাকে কানে চিমটি কেটে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

এবারে ঠাকুরদা যে সন্দেশ এনেছিলেন তা খেয়ে আর কারো নাক সিঁটকোতে হয় নি।

নরওয়ে দেশের পুরাণ

আমাদের দেশের পুরাণে যেমন দেবতা আর অসুরের গল্প আছে, পুরাতন নরওয়ে আর সুইডেন দেশের পুরাণেও তেমনি সব দেবতা আর অসুরের কথা লেখা আছে।

নরওয়ের পুরাণে আছে যে, সেকালের আগে যখন পৃথিবী বা সমুদ্র বা বায়ু কিছুই ছিল না—তখন কেবল বিশ্ব-পিতা (All father) ছিলেন। তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি যাহা চাহেন, তাহাই হয়। সৃষ্টির আগে চারিদিকেই শূন্য আর অন্ধকার

ছিল, সেই শূন্যের মাঝখানে ছিল গিন্নুঙ্গা নামে গহবর। সেই গহবরের উত্তরে কুয়াশার দেশ, তাহার মাঝখানে হ্বারগেল্‌মির নামে ঝরনার গরম জল টগবগ করিয়া ফুটিত।

সেই গহবরের দক্ষিণে মুস্পেল্‌স্‌হাইম্‌, অর্থাৎ আগুনের দেশ, সুর্ত্‌র্‌ নামে বিশাল দৈত্য জ্বলন্ত তলোয়ার হাতে সেই দেশে পাহারা দিত।

সেই যে গিন্নুঙ্গা নামে গহবর, তাহার ভিতরটা ছিল বড়ই ঠান্ডা। হ্বার-গেল্‌মির ঝরনার জল তাহাতে পড়িয়া বরফ হইয়া যাইত, সুর্ত্‌রের তলোয়ার হইতে আগুনের ফিনকি পড়িয়া সেই বরফকে গলাইয়া দিত। সেই আগুন আর বরফের লড়াই হইতে গিন্নুঙ্গা গহবরের ভিতরে য়ীমির নামক অতি ভীষণ দৈত্য আর আধুম্‌লা নামে গাই- জন্মাইল। য়ীমির আধুম্‌লাকে পাইয়া

তাহার দুধ খাইতে লাগিল, আর আধমুলা আশপাশের বরফে লবণের গন্ধ পাইয়া তাহাই চাটিতে আরম্ভ করিল। চাটিতে চাটিতে সেই বরফের ভিতর হইতে একটি দেবতা বাহির হইলেন, তাঁহার নাম বুরি।

এই য়ীমির হইতে অসুর আর বুরি হইতে দেবতাগণের জন্ম, আর জন্মাবধিই অসুর আর দেবতার বিবাদ। যুগ যুগ ধরিয়া সেই বিবাদ চলিতে থাকে, শেষে অনেক যুদ্ধের পর দেবতারা য়ীমিরকে মারিয়া ফেলেন। আর যত অসুর ছিল, য়ীমিরের রক্তের বন্যায় সকলেই ডুবিয়া মরে, বাকি থাকে কেবল বার্গেল্মির আর তাহার স্ত্রী। এই দুজনে একখানি নৌকায় করিয়া সকল জায়গার শেষে একেবারে ব্রহ্মাণ্ডের কিনারায় গিয়া ঘর বাঁধিল। সেই স্থানের নাম হইল 'জোতন্হাইম' বা দৈত্যপুরী। সেই দৈত্যপুরীতে অসুরের বংশ বাড়িতে লাগিল, দেবতা-অসুরের বিবাদও আবার জাগিয়া উঠিল।

এদিকে অসুর সব মরিয়া যাওয়াতে দেবতারা কিছুদিনের জন্য যেন একটু আরাম পাইলেন। তখন তাঁহাদের মনে হইল যে, চারিদিকে কেবলই শূন্য আর কুয়াশা আর আগুন আর বরফের লড়াই দেখিতে একটুও ভাল লাগে না। তাই তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন যে, চলো আমরা য়ীমিরের দেহ হইতে গাছ-পালা নদ-নদী আর পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি করি। এই বলিয়া তাঁহারা য়ীমিরের বিশাল দেহটাকে সকলে মিলিয়া গড়াইয়া গিন্নুঙ্গা গহ্বরে নিয়া ফেলিলেন। তাহাতে গহ্বরও বুজিল, এই সৃষ্টি রাখিবার একটা জায়গাও জুটিল। য়ীমিরের রক্তে সমুদ্র ত আগেই হইয়াছিল উহার মাংসে মাটি গড়িতেও বেশি বেগ পাইতে হইল না, হাড় আর দাঁত হইল পাহাড়-পর্বত, চুল-দাড়ি হইল গাছপালা, মাথার খোলটা হইল আকাশ, মগজগুলি হইল মেঘ, কাছেই আগুনের দেশ ছিল, যেখানে সেই সুর্ত্ নামক দৈত্য থাকিত—সেই-খানকার আগুনের ফিনকি দিয়া চন্দ্র সূর্য আর তারা হইল।

এদিকে কিন্তু য়ীমিরের মাংস পচিয়া তাহাতে পোকা ধরিয়াছে। দেবতারা ভাবিলেন, 'তাই ত, এই পোকাগুলিকে কি করা যায়? এগুলি হইবে পরী, ভূত আর বামন।' পরীরা দেখিতে ভারি সুন্দর; তাহারা আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে থাকে, চাঁদের আলোতে খেলা করে, প্রজাপতির পিঠে চড়িয়া ফুলগুলিকে ফুটাইতে আসে, আর নানামতে লোকের উপকার করে। ভূত আর বামনগুলি দেখিতে যেমন বিশ্রী তেমনি দুষ্টু। তাহারা মাটির নীচে থাকে, সোনা-রুপা মণি-মানিকের সন্ধান রাখে, আর লোকের মন্দ করিতে রাত্রে বাহিরে আসে। দিনে তাহাদের মাটির উপরে আসিবার হুকুম নাই, আসিলে পাথর হইয়া যায়।

সকলের মাঝখানে দেবতারা আগেই তাঁহাদের নিজের থাকিবার জায়গা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জায়গার নাম আস্গার্ড বা স্বর্গ। সেখানকার রাজা ছিলেন বিশ্ব-পিতা। তাঁহার অন্য নাম ওডিন (Odin) বা উওডেন (Woden)— যাহা হইতে বুধবারের নাম ওয়েডনেজ ডে হইয়াছে। ইঁহা হইতেই সকল দেবতা আর মানুষের জন্ম, ইঁহার নাম বিশ্ব-পিতা।

স্বর্গের সকলের চেয়ে উঁচু সিংহাসনে ওডিন তাঁহার রানী ফ্রিগ্গার

(Frigga) সহিত বসিয়া স্বর্গ মর্ত পাতাল কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ লইতেন; কিছুই তাঁহার চোখ এড়াইতে পারিত না। ওডিনের একটিমাত্র চোখ ছিল, আর একটি চোখ তিনি মিমির নামে এক বুড়াকে দিয়াছিলেন। সেই বুড়ার একটা ঝরনা ছিল, তাহার জল খাইলে ভূত ভবিষ্যৎ সকল বিষয় জানা যাইত। ওডিন সেই ঝরনার জল খাইতে গেলেন; বুড়া বলিল, 'তোমার একটি চোখ না দিলে জল খাইতে পাইবে না।' কাজেই একটি চোখ খুলিয়া দিয়া ওডিনকে সেই জলের দাম দিতে হইল। বুড়া সেই চোখটি নিয়া তাহার ঝরনার জলে ডুবাইয়া রাখিল। সেখানে সেটি দিনরাত ঝিকমিক করিত। ওডিন ঝরনার জল খাইয়া সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হইলেন। আর সেই ঘটনার চিহ্ন রাখিবার জন্য ঝরনার ধারের গাছের ডাল দিয়া একটা বল্লম তয়ের করাইয়া লইলেন। সে এমনি আশ্চর্য বল্লম যে, কিছুতেই তাহাকে ঠেকাইতে পারিত না।

ওডিনের এক পুত্রের নাম টিউ (Tiu)। ইঁহার নামে মঙ্গলবারের নাম টিউজ ডে (Tuesday) হইয়াছে। ইনি বীরত্ব এবং যুদ্ধের দেবতা। ওডিনের যেমন একটা আশ্চর্য বল্লম ছিল, ইঁহার তেমনি একটা তলোয়ার ছিল। লোকে এই তলোয়ারকে বড়ই ভক্তি করিত, আর যার পর নাই যত্নে একটা মন্দিরের ভিতরে তাহা রাখিয়া দিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই তলোয়ার যাহার কাছে থাকিবে সে কখনো যুদ্ধে হারিবে না। কিন্তু হায়! একদিন কে সেই তলোয়ার চুরি করিয়া লইয়া গেল। শুনা যায়, তারপর সেই তলোয়ার লইয়া অনেকে পৃথিবী জয় করিয়াছে, আবার সেই তলোয়ারেই তাহারা মারা গিয়াছে। এমনি করিয়া তাহার দ্বারা কতই কান্ড হইল। কিন্তু টিউর ঘরে আর তাহা ফিরিয়া আসিল না।

ওডিনের আর-এক পুত্র থরের (Thor) নামে ইংরাজি থার্সডে (Thursday) হইয়াছে। থরের মত জোর কোনো দেবতার ছিল না, দেখিতেও কেহ তাঁহার মত এমন বিশাল ছিলেন না। তাঁহার হাতুড়ি দিয়া যাহাকেই তিনি ঠাঁই করিয়া মারিতেন, সে পাহাড়ই হউক, আর পর্বতই হউক, তখনই গুঁড়া হইয়া যাইত। স্বর্গে বাইফ্রেস্ট্ নামে বিচিত্র সেতু আছে (যাহাকে তোমরা বল রামধনু)। সেই সেতুর উপর দিয়া দেবতারা যাওয়া আসা করিতেন। অর্থাৎ আর সকল দেবতারাই করিতেন—কিন্তু থর কখনো সেই সেতুর উপর যাইতেন না, গেলে তাহা ভাঙিয়া পড়িত।

ফ্রাইডে (Friday, শুক্রবার) যাঁহার নামে হইয়াছে, তাঁহার নাম ছিল ফ্রিয়া (Freya)। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা। কেহ বলে, ইনিই ওডিনের রানী ফ্রিগ্গা। যুদ্ধে যত বীরের মৃত্যু হইত, তাহাদের অর্ধেক ফ্রিয়ার কাছে যাইত। ফ্রিয়া তাঁহার সঙ্গিনী ভ্যাল্কীরদিগকে লইয়া সেই বীরদিগকে নিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিতেন। তাঁহার সভায় গিয়া বীরদিগের সুখের আর সীমা পরিসীমা থাকিত না। সেখানে হাইড্রুন নামে ছাগল ছিল, তাহার দুধ ছিল অমৃতের মত, সে দুধ দোহাইয়া শেষ করা যাইত না। আর সেহ্রিম্নির নামে যে শুয়োরটি ছিল, তাহার মাংসও ছিল তেমনি মিষ্ট। এলড্রিম্নির নামে পাচক তাহা ততোধিক মিষ্ট করিয়া রাঁধিত। বীরের ক্ষুধা—বুঝিতেই পার,

তাহারা খাইত কেমন! কিন্তু সে মাংস কিছুতেই ফুরাইত না। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেলে আবার যেমন শুয়োর তেমনিটি বাঁচিয়া উঠিয়া ঘোঁত্ ঘোঁত্ করিতে থাকিত।

ঠানদিদির বিক্রম

আমাদের এক ঠানদিদি ছিলেন। অবশ্য ঠাকুরদাদাও ছিলেন, নইলে ঠানদিদি এলেন কোত্থেকে? তবে ঠাকুরদাদাকে পাড়ার ছেলেরা ভালরকম জানত না। ঠাকুরদাদার নাম রামকানাই রায়; লোকে তাঁকে কানাই রায় বলে ডাকত, কেউ কেউ রায়মশায়ও বলত।

ঠাকুরদাদাকে যে ছেলেরা জানত না তার একটু নমুনা দিচ্ছি। ঠানদিদির বাড়িতে এক-ঝাড় তল্‌তা বাঁশ ছিল, ঐ বাঁশে ভাল মাছ ধরবার ছিপ হত। একবার কয়েকটি ছেলে ছিপ তৈরি করবে বলে চুপিচুপি একটি বাঁশ কেটে রাস্তায় টেনে এনেছে, অমনি দেখে—রায়মশায় সম্মুখে। তারা তখনি হাত জোড় করে বললে, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না!' তিনি ত শুনে অবাক!—'আরে বলিস কি? আমার বাঁশ নিয়ে পালাচ্ছিস, আর বলছিস "বলবেন না"!'

ছেলেগুলি সকলে মিলে কেবলই বলতে লাগল, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না।' তখন রায়মশায় বেগতিক দেখে বল্‌লেন, 'তোরা বাঁশ দিয়ে কি করবি?' 'আজ্ঞে, ছিপ করব।' 'আচ্ছা, নিয়ে যা।' তখন আবার 'দেখবেন, ঠানদিদিকে যেন বলবেন না' বলে ছেলেগুলো বাঁশ নিয়ে ছুট। এখন বোধ করি তোমরা বুঝতে পারছ, রায়মশাই যে ঠাকুরদাদা তা অনেক ছেলেই জানত না। ছেলেরা জানত—ঠানদিদির বাড়ি। ঠানদিদির বাঁশঝাড়, ঠানদিদির কাঁঠালগাছ, বিশেষ ভাবে ঠানদিদির কুলগাছ আর পেয়ারাগাছ।

ঠানদিদির পুত্রসন্তান নেই, কেবল তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ে দুটির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, ছোটটির বয়স ন-দশ বৎসর। ঠানদিদির বয়স চল্লিশের উপর। বাড়িতে অন্য লোকজন নেই, কিন্তু তা হলেও, ঠাকুরদাদা বিদেশে গেলে ঠান-দিদির চৌকিদার বা ঘরে শোবার জন্য বুড়ো স্ত্রীলোকের দরকার হয় না। ঠানদিদি অনায়াসে একাই থাকেন।

একবার ঠাকুরদাদা বিদেশে গিয়েছেন। ঠানদিদি কেবল ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে আছেন, সেই সময়ে একদিন দুপুর রাত্রে মেয়েটি বলল, 'মা! কে যেন আমার গায়ে হাত দিল!' ঠানদিদি বললেন, 'চুপ কর, কথা বলিস না।' ঠানদিদি পূর্বেই টের পেয়েছেন, ঘরে চোর ঢুকেছে। তারপর চোর যেই বাক্স-পেঁটরার সন্ধানে ঘরের অন্য দিকে গিয়েছে, অমনি ঠানদিদি আস্তে আস্তে উঠে, বাটনাবাটা শিলখানা এনে সিঁদের মুখে চাপা দিলেন।

তোমরা শহরের ছেলেরা বোধ করি বুঝতে পারলে না, সিঁদ কি। পাড়াগাঁয়ে অনেক মেটে ঘর। ঐ-সব মেটে ঘরে সিঁদকাঠি খুঁড়ে চোর ঘরের

ভিতর ঢুকে চুরি করে। এইবার আরো মুশকিল হল, সিঁদকাঠি কি? সিঁদকাঠি যে কি তা আমিও কখনো চোখে দেখি নি। সম্ভবত ওটা খন্তা বা সাবলের মত লোহার কোন অস্ত্র হবে।

এই সিঁদকাঠি তৈরি সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'চোরে কামারে কখনো দেখা হয় না।' সিঁদকাঠি যখন লোহার অস্ত্র, তখন অবশ্যই ওটা কামারে গড়ে। কিন্তু চোর কি কামারের বাড়ি গিয়ে বলে, 'কর্মকার ভায়া, আমাকে একটা সিঁদকাঠি তৈরি করে দাও!' নিশ্চয়ই না; তা হলে ত সেইখানেই সে চোর বলে ধরা দিল। কামার ভায়া চোরের নিতান্ত বন্ধু হলেও, সময় মত অন্য দু-দশজন বন্ধুর কাছে সে গল্পটা করবেই। দরকার হলে পুলিশের কাছেও বলতে পারে।

তবে চোর কি করে সিঁদকাঠি গড়ায়? আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম। চোরের সিঁদকাঠির দরকার হলে, চোর একখানি লোহা আর একটি আধুলি রাত্রে কামারশালের এমন জায়গায় রেখে যায় যে কামার সকালে কামারশাল খুলবার সময়েই সেটা তার নজরে পড়ে। তখন কামার অন্য কাজ বন্ধ রেখে সকলের অসাক্ষাতে সিঁদকাঠিটি তৈরি করে। কামারশাল বন্ধ করবার সময় ঠিক সেই জায়গায় সেটি রেখে দেয়। রাত্রে চোর এসে সেটি নিয়ে যায়।

এখন আসল কথা শোনো। ঠানদিদি সিঁদের মুখে শিলটি চাপা দিয়ে তার পাশে চুপ করে বসে আছেন। তারপর চোর একটি বাক্স এনে সিঁদের কাছে যেমন নামিয়েছে, অমনি বেটাকে জাপটে ধরেছেন। তখন চোর নাকি সুরে বলল, 'মা ঠাকরুন, ছেড়ে দিন!' ঠানদিদি বললেন, 'বল্ বেটা তুই কে? নইলে এখনি পাড়ার লোক ডেকে তোকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব। চোর দেখল নাম না বললে আর নিষ্কৃতি নেই, কাজেই বলল, 'মা ঠাকরুণ আমি শীতল!' তা শুনে ঠানদিদি বললেন, 'হতভাগা! মরতে আর জায়গা পাও নি? যাও! ঐ বাইরে কলসী আছে—পুকুরে গিয়ে জল আনো, তারপর কাদা করে সিঁদ বোজাও। ঐ গোয়ালে গোবর আছে; গোবর দিয়ে ভিতরবার ভাল করে নিকিয়ে দিয়ে যাও। আমি সকালে উঠে এ সব হাঙ্গামা কত্তে পারব না।'

শীতল তখন কলসীটি নিয়ে আস্তে আস্তে পুকুর ঘাটে গেল। তখন ফাল্গুন মাস, পাড়া গাঁয়ে বেশ শীত। সেই শীতে পুকুর থেকে জল এনে কাদা করে, সিঁদ বুজিয়ে, ভাল করে নিকিয়ে তবে শীতল ছুটি পায়!

তোমরা চালাক ছেলেরা ভাবছ, চোরটা কি বোকা, কলসী নিয়ে অমনি পালাল না কেন? শীতল কলসী নিয়ে পালালে তার কি দশা হত, তা আর একদিন তোমাদের বলব।

ঘ্যাঘাসুর

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি, হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যেও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিন দিনই

রোগা হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়; এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন, 'যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষির বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষি অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু ত নয়, যেন রসগোল্লা! এক-একটা বড় কত! যেন এক-একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাওও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষির তিন ছেলে; যদু, গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষি যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল, 'শিগ্গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ঝুড়িতে কি ও? যদু বলিল, 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজার দরোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যার পর নাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজামহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন; আর অমনি চারিটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে-প্রাণে বাড়ি ফিরিল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এরপর চাষি আর-এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি।' একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দরোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল, 'তোরই মতন একটা সেদিন এসে রাজামশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে

গেছে। তুই আবার একটা কি করে বসবি কে জানে!' অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে কেহ বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষি তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও এক ঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। একহাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝুড়িতে কি ও?' মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যার পর নাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাত জোড়ের পর দরোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি হয় না। তা হলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামহাশয় ত খুবই খুশি! তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়, আমাকে খবর দিস্!' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে!

ইহাতে রাজামহাশয় যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন—'তাই ত, করিয়াছি কি। এখন যে চাষির ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়!' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে চাষির ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে, 'এরপরই বুঝি মেয়ে বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজামহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর-একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মানুকে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর

হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেইদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে: পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে?—'গামলা'। আচ্ছা, তাই হোক।'

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল; যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মত গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তির চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল; এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল—'জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে, রাজামশাই বলেছেন, মেয়ে বিয়ে দেবেন।' এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই: অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড় নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা-রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তা কি বলিব। যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজামহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না: আর-একখানা কাজ করিয়া দিতে হবে। একগাছ ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে।' মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখি, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্‌ঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা

নদীর ধারে, অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, রসগোল্লাটির মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারো বাড়িতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঁঘা তার কোন সন্ধান বলতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা কোরো ত।' মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর-একদিন সে আর-এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার বেয়ারামটা যে কি কোনো ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলিল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব।'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিজ্ঞেস কোরো ত! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে ক'রে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' মানিক বলিল, 'তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শিগ্গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিল্বে।' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন ক'রে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার ক'রে দিলে, সে বাড়ি যাবে কেমন ক'রে?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই আর তাকে একশো খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু?' মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না; একগাছি পালব আমায় চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক্‌। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।' মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে; সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ—মানুষের গন্ধ। মানুষ দে, খাই।'

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়াই পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ!'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হয়েছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ ত একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হাঁ হাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ—।' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, 'কোনা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে—?' ঘ্যাঁঘা বলিল, সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না! তাহলেই ত সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে!'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হল?' মানিক বলিল; 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এরপর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তা হলেই

তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক, যাহাদের মেয়ের অসুখ ছিল, তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোনা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়া ছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশি হইল, তাহা কি বলিব! মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই-সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যার পর নাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। রাজামহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন, 'ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই; ততক্ষণ সে ডাঙগায় উঠিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি পানে ছুটিয়াছে, তাড়াতাড়িতে রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনো ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

বুদ্ধিমান চাকর

এক বাবুর একটি বড় বুদ্ধিমান চাকর ছিল, তার নাম ভজহরি। একদিন ভজহরি পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল তার বাবু ভারি ব্যস্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, কোথায় যাচ্ছেন?' বাবু বললেন, 'শিগ্গির এস ভজহরি, সর্বনাশ হয়েছে—আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে!' তাতে ভজহরি বলল, 'আপনার কোন ভয় নাই বাবু, ও মিছে কথা। আগুন কি করে লাগবে? আমার কাছে যে ঘরের চাবি রয়েছে!'

ভজহরি গেল কলুর দোকানে, এক সের তেল কিনতে। কলু তাকে এক সের তেল মেপে দিল, তাতেই তার বাটিটি ভরে গেল। তখন ভজহরি বলল, 'ফাউ দেবে না?' কলু বলল, 'হ্যাঁ দেব বইকি! কিসে করে নেবে?' ভজহরি ভাবল, 'তাই ত, কিসে করে নিই? কিন্তু ফাউ না নিয়ে গেলে যে বাবু আমাকে বোকা ভাববেন!' তখন তার মনে হল যে বাটির তলায় একটু গর্ত আছে। অমনি সে বাটিটি উল্টিয়ে নিয়ে সেই গর্তটা দেখিয়ে কলুকে বলল, 'এতে ফাউ দাও।' কলু হাসতে হাসতে সেই গর্তে ফাউ ঢেলে দিল, ভজহরি মহা খুশি হয়ে তাই নিয়ে বাড়ি এল।

ভজহরি তার বাবুর সঙ্গে নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। নৌকায় ঢের লোক, ভজহরি ভাবল নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, যদি ডুবে যায়! এই ভেবে, সে তাদের পুঁটলিটা মাথায় করে বসে রইল। বাবু বললেন, 'ভজহরি, পুঁটলিটা নামিয়ে রাখ না, মাথায় করে কেন কষ্ট পাচ্ছ?' ভজহরি বলল, 'আজ্ঞে না, নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, পুঁটলিটা তাতে রাখলে আরো বোঝাই হয়ে যাবে।'

বাড়িতে চোর এসেছে, ভজহরি তা টের পেয়েছে। সে ভাবল, বেটাকে ধরতে হবে। তখন সে মাথায় শিং বেঁধে লেজ পরে উঠানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মতলবখানা এই যে, চোর নিশ্চয় তাকে দেখে ছাগল মনে করে তাকে চুরি করতে আসবে, তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরবে। চোর এল, ঘরে গিয়ে ঢুকল, ভজহরি উঠানের কোণ থেকে বলল, 'ম্যা-আ-আ আ!' চোর ঘরের সব জিনিসপত্র বাইরে এনে একটি পুঁটুলি বাঁধল, ভজহরি তাকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ' তা চোর তাড়াতাড়ি সেই পুঁটুলি নিয়ে আঁস্তাকুড়ের উপর দিয়ে ছুট দিল। তখন ভজহরি হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বলল, 'ব্যাটা কি বোকা, আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে গেল, এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে!'

রামধন লোকটি বেশ সাদাসিধে, কিন্তু একটু রাগী। সে গিয়েছে চোরেদের বাড়ি চাকরি করতে। রাত্রে চোরেরা এক জায়গায় চুরি করতে গেল, রামধনকেও সঙ্গে নিল। সেখানে রামধনকে একটা কচুবনে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই এইখানে চুপ করে বসে থাক, আমরা চুরি করে জিনিস নিয়ে এলে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবি।' রামধন বলল, 'আচ্ছা।'

চোরেরা সিঁদ কাটছে, রামধন কচুবনে বসে আছে। সেখানে বেজায় রকমের মশা, রামধনকে কামড়িয়ে পাগল করে তুলল। বেচারা অনেকক্ষণ সয়ে চুপ করে ছিল, তারপর চটাস্ চটাস্ করে দু-একটা মারতে লাগল। শেষে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে মেরে কচুবন তোলপাড় করে তুলল। সেই শব্দে বাড়ির লোক সব জেগে গিয়ে বলল, 'কে রে তুই এত গোলমাল করছিস?' রামধন বলল, 'আমি রামধন গো।' বাড়ির লোকেরা বলল, 'ওখানে কি করছিস?' রামধন বলল, 'আপনাদের ঘরে যে সিঁদ হচ্ছেন!'

তখন ত আর ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকির সীমাই রইল না। চোরেরা আর চুরি করবে কি, তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই ভার হল। ঘরে এসে তারা তারপর অবশ্যি রামধনের উপর খুবই চোটপাট লাগাল। সে বলল, 'কি করি ভাই, আমার রাগ হয়ে গেল; যে ভয়ানক মশা!' চোরেরা বলল, 'আচ্ছা, খবরদার! আর কখনো এমন করিস নে।'

পরদিন চোরেরা আবার রামধনকে নিয়ে চুরি করতে গিয়েছে। এবারে রামধন ঠিক করে এসেছে যে, মশায় তাকে খেয়ে ফেললেও আর সে টুঁ শব্দটি করবে না। আর চোরেরাও বেশ বুঝে নিয়েছে যে, রামধনকে বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলে বড়ই বিপদ হতে পারে। তাই তারা ভেবেছে ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা বাড়ির কাছে এসে চোরেরা বাইরে থেকেই কেমন করে তার একটা দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলল, তারপর রামধনকে বলল, 'এখন তুই চুপি-চুপি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র বার করে আন্। দেখিস কোন শব্দ করিস না যেন।' রামধন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গেল। দরজার কব্জায় ছিল মরচে ধরা, তাই দরজা ঠেলতেই সেটা বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন থতমত খেয়ে অমনি থেমে গেল। তারপর আবার যেই ঠেলতে যাবে, অমনি দরজা আবার বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন তাতে দাঁত খিঁচিয়ে 'আঃ!' বলে আবার থেমে গেল। তারপর রামধন কিছুতেই আর রাগ সামলাতে পারল না। তখন সে পাগলের মত হয়ে প্রাণপণে সেই দরজা নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ক্যাঁচ্!—ক্যাঁচ্!!—ক্যাঁচ্!!!—ক্যাঁচ্!!!!' তারপর কি হল বুঝতেই পার।

এ-সব ত শুধু গল্প, এবার একটি সত্যিকারের চাকরের কথা বলি। তার নাম, ধরে নাও যেন কেনারাম। কেনারাম সেজেগুজে একটা বোটের ছাতে উঠে বসে আছে—তার বাবুর সঙ্গে এক জায়গায় তামাশা দেখতে যাবে। খানিক বাদেই বোটের ভিতর থেকে জুতোর শব্দ এল; কেনারাম বুঝল বাবু বেরুচ্ছেন, এইবেলা যেতে হবে। সে অমনি তাড়াতাড়ি বোটের ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল—আর পড়ল ঠিক তার বাবুর ঘাড়ে।

প্রথমে যখন কেনারাম আসে তখন একজন পুরনো চাকর বলেছিল, 'বাবু কাছারি থেকে এলে রোজ তাঁকে পান খেতে দিও।' সেদিন বাবু কাছারি থেকে এসেই পায়খানায় গেলেন, কেনারামও তাড়াতাড়ি সেইখানেই গিয়ে তাঁকে বলল, 'বাবু পান এনেছি।'

বেচারাম কেনারাম

প্রথম দৃশ্য

(জামা রিপু করিতে করিতে কেনারাম চাকরের প্রবেশ)

কেনা। ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল! ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়, তা রিপু করব কি? ভাল মনিব জুটেছে যাই হোক, এই জামাটা দিয়েই ক'বছর কাটালে। তিন বছর ত আমিই এইরকম দেখছি, আরো বা ক'বছর দেখতে হয়। তবু যদি চারটে পেট ভরে খেতে দিত! তাও কেমন? সকালে মনিব চারটি ভাত খান, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্তিরে তিনি হাঁড়ি চাটেন, আমি শুঁকি। তার উপর শ্রবণশক্তিটি কি প্রখর! বাড়িওয়ালা সেদিন টাকার জন্যে কি-ই না বললে! বাড়িওয়ালা বলে, 'টাকা দেও, ঢের টাকা বাকি।' মনিব বলেন, 'তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ি আজ নেমন্তন্ন?' বাড়িওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলে কই?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা, চাকরটিও সঙ্গে যাবে।' বাড়িওয়ালা বেচারী, রেগেমেগে চলে গেল। বড়লোক হতে হলে বোধহয় আমার মনিবের মতই কত্তে হয়, কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড়লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড়লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ এই তিন বছরে একটি পয়সা মাইনে দিলেন না! দেখি আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ করা হচ্ছে না।

[প্রস্থান

(বেচারাম মনিবের প্রবেশ)

মনিব। চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথাই বলছিল! সব শুনেছি। বেটা ভেবেছে, আমি সত্যিই কালা। আরে আমার মত যদি কান থাকত তা হলে আর চাকরি কত্তে হত না। আমি যা করে খাই, তাই করে খেতে পাও। ঘরের ভিতরে ক'জন লোক, ক'জন জেগে আছে, ক'জন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি। কোথায় সিন্দুকের ভেতর আরশুলা কড়কড় কচ্চে, বাইরে থেকে বুঝে নি। বাপু হে! কানে শুনি, কানে শুনি। কানে শোনাটা ত বেশ ভালই,

কিন্তু না শোনার যে সুবিধা আছে, তা ত বুঝবে না? এই সেদিন বাড়ি-ওয়ালা বেটা ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় কত্ত! কানে না শোনার কত সুবিধা দেখো, পাওনাদারের টাকা দিতে হয় না, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, চাকরের মাহিনা দিতে হয় না—

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা (উচ্চৈঃস্বরে)। মশাই, হয় এই তিন বছরের মাইনে দিন, নাহয় আপনার এই-সব রইল, আমি চললেম।

মনিব। ডাকওয়ালা? চিঠি? দেখি?

কেনারাম (স্বগত)। এই মুশকিল কল্লে! তা এবারে বাপু এক ফন্দি এ'টেছি—সব লিখে এনেছি। (প্রকাশ্যে) চিঠিই বটে, এই নিন্।

মনিব (পাঠ)। 'মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসরের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।'—তাই ত, তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় ত কোন বন্দোবস্ত হয় নি, কাজকর্মও তেমন ভাল করে কর নি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশি তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নেও। (তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা। এই বড়লোক হলাম আর কি! তিন-তিন বছরের মাইনে; ঢের টাকা—ঢের টাকা। এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়, দশ এগার বার। (পয়সা তিনটি পকেটে স্থাপন)

(ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূতের প্রবেশ)

স্বর্গীয় দূত। আরে ভাই, তোর যে ভারি ফুর্তি?

কেনা। কে ও? ছোট্ট মানুষ? দাঁড়াও চশমাটা বার করে নি।

দূত। কেন! চোখে কম দেখ বুঝি?

কেনা। তা কেন? বড়লোক হয়েছি যে, ছোটমানুষ আর তেমন চট করে চোখে মালুম পড়ে না।

দূত। বটে! এত বড়লোক কি করে হলি ভাই?

কেনা (পকেট চাপড়াইয়া)—তি—ন—টি ব—ছ—রে—র মা—ই—নে। (এক-একটি পয়সা বহিষ্করণ ও গম্ভীরভাবে গণন) এ—এ—এ—ক, দু—উ—উ—ই, তি—ই—ই—ই—ন (পকেট উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান)।

দূত। তাই ত ভাই, এত টাকা নিয়ে তুই কি করবি? আমি গরীব, আমাকে কিছু দে-না।

কেনা। নিবি? এই নে; ভগবান আমাকে খেটে খাবার শক্তি দিয়েছেন, খেটে খাব। (পয়সা তিনটি প্রদান)

দূত। তুই ভাই বেশ লোক, তোর মনটা খুব খোলা। আমি ঈশ্বরের দূত, ভাল লোক দেখলে পুরস্কার দি। তোর ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি, তুই কি চাস্ বল্, যা চাস তাই পাবি।

কেনা। অ্যাঁ, আপনি ঈশ্বরের দূত? তবে ত আপনার সম্মুখে আমি বড় বেয়াদবি করেছি?

দূত। তোর কিছু ভয় নেই, তুই আমাকে 'তুই' 'তুমি' যা খুশি বল্, কিছুতেই বেয়াদবি হবে না; এখন তুই কি নিবি বল্।

কেনা। তা দাদা, যদি দেবে তবে এমন একখানা বেয়ালা দাও যে, যে তার আওয়াজ শুনবে তাকেই তিড়িং তিড়িং করে নাচতে হবে।

দূত (ঝুলি হইতে বেহালা বাহির করিয়া)। এই নে।

কেনা। বাঃ, বেশ হল, আমাকে ত সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে না?

দূত। না, সে ভয় তোর নেই, যা এখন ফুর্তি করগে। (দূতের প্রস্থানোদ্যম ও কেনারামের বাদ্যোদ্যম) আরে দূর হতভাগা, আমারই উপর পরীক্ষা করে বসলি।

কেনা। তুমিই যে ফুর্তি করতে বললে দাদা!

দূত। আমি আগে যাই, তারপর করিস।

কেনা। আ—চ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। ঐ ঝোপটাতে ফেলে গিছলুম। পুলিশ বেটা এমনি তাড়া কল্লে, ধরেই ফেলেছিল আর কি। চট করে টাকার থলেটি ঐ ঝোপটাতে ফেলে পালালুম, এখন পেলে বাঁচি। (থলি খুঁজিতে ঝোপে প্রবেশ) বাপ রে, কি ভয়ানক কাঁটা—এই পেয়েছি!

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা (স্বগত)। ঐ যে বেচুবাবু কাঁটাবনে ঢুকেছেন; এইবারে এক গৎ বাজিয়ে নি, পুরোনো মনিবটে! (বেহালাবাদন)

বেচা (নৃত্য করিতে করিতে)। আরে! আরে! ও কী? উঃ আঃ! আরে তুমি কি—উঃ হু হু—আরে আর না—জামাটা—উঃ—হু জামাটা গেল যে, উঃ—গায়ের চামড়াও যে ছিঁড়ে গেল—উঃ!

কেনা। আজ্ঞে, আমি আপনার বকেয়া চাকর কেনারাম, মাইনে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে কি এমন মনিবকে ভুলতে পারি? আপনাকে বাজনা শুনিয়ে আমার বেয়ালা সার্থক হল। (পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বাদন)

বেচা (নৃত্য)। কি মুশকিল। বাবা কেনারাম, রক্ষে করো বাবা। এ কি বাজনা যে শুনলেই নাচতে হয়! বাবা আর কাজ নেই, আমি খুব খুশি হয়েছি, এই টাকার থলি তোমায় দিচ্ছি, তোমার মাইনে এ থেকে পুষিয়ে নাও, দোহাই বাবা, আমায় নাচিও না। (টাকার থলি কেনারামের হাতে প্রদান)

কেনা (বিনীত অভিবাদন করিয়া)। আজ্ঞে, না হবে কেন? আপনার মত মনিব না হলে গুণ কে বোঝে! দেখছি বেয়ালার আওয়াজে আপনার 'কানে খাট'র ব্যারামটাও বেশ সেরে গেল। ভাল ভাল, আর এ ব্যারামের সূত্রপাত দেখলে আমায় খবর দেবেন, আমি বেয়ালা নিয়ে এসে চিকিৎসা করব। (দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

বেচা। হতভাগা বেটা, লক্ষ্মীছাড়া বেটা, জোচ্চোর, বাটপাড়, ডাকাত—বেটাকে দেখাচ্ছি। পুলিশ! পুলিশ! চোর—চোর!

চতুর্থ দৃশ্য

(বিচারালয়। ব্যস্তভাবে বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। দোহাই হুজুর, আমাকে ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হো হো (ক্রন্দন)

বিচারক। আরে ব্যাপার কি? তোমার কি হয়েছে?

বেচা। (কাঁটার আঁচড় ও ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখাইয়া)—আর কি হবে, আমি ধনে-প্রাণে গিয়েছি। বড় রাস্তার ধারে ঐ কেনা বেটা আমাকে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে—এ্যঁ হেঁ হেঁ (ক্রন্দন)। বেটাকে তিন বছর আমি খাইয়ে মানুষ কল্লুম, আর তার এই প্রতিশোধ দিলে। বেটা দিনরাত বেহালা নিয়ে ফেরে, এখনি ধরতে পাঠান, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন।

বিচারক। চারজন লোক এখনি গিয়ে কেনারামকে ধরে নিয়ে এসো।

(কেনারামকে লইয়া চারজন লোকের প্রবেশ)

বেচা। ঐ! ঐ! ঐ বেটা! হুজুর! ঐ কেনারাম বেটা আমার সর্বনাশ করেছে, বেটাকে আচ্ছা করে—

বিচারক। চুপ। (কেনার প্রতি) তুমি একে মেরে এর টাকা কেড়ে নিয়েছ?

কেনা। সে কি? হুজুর! উনি আমার বেয়ালা বাজানো শুনে আমায় এক থলি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন—আমি যথার্থ বলছি।

বিচারক। ওর যে চেহারা দেখছি, তাতে ও যে বেহালা শুনে তোমায় এতগুলো টাকা দিয়েছে তা আমি কিছুতে বিশ্বাস কত্তে পারি নে। আর ওর গায়েও এই-সব দাগ দেখছি। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে তুমিই ওকে মেরে টাকার থলি কেড়ে নিয়েছ। এ ডাকাতি; ডাকাতির শাস্তি ফাঁসি—তোমার ফাঁসি হবে। এখন তোমার যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে ত বলো।

কেনা। হুজুর, আমার আর কোন সাধ নেই। খালি জন্মের মত বেয়ালা-খানা একবার বাজাতে চাই।

বেচা। সর্বনাশ! হুজুর এমন হুকুম দেবেন না।

চাপরাসী। (বেচারামকে রুলের গুঁতা মারিয়া) চুপ্ রও।

বিচারক। আর কোন সাধ তোমার নেই? আচ্ছা বাজাও।

(কেনারামের উৎসাহের সঙ্গে বেহালাবাদন ও বিচারক হইতে চাপরাসী পর্যন্ত সকলের নৃত্য।)

বিচারক (হাঁপাইতে হাঁপাইতে)। আরে বাপু! থাম্ থাম্; শিগ্গির থাম্; তোকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি, প্রাণ যায়—থাম্। বাপ রে, এ কিরকম বেহালা বাজনা!

কেনা (সেলাম করিয়া)। হুজুর! বেচুবাবুকে এখন সমস্ত সত্য ঘটনা বলতে হুকুম হয়। নইলে আমি পুনরায় বেয়ালায় ছড়ি দিলাম।

বিচারক (বেচারামের প্রতি সরোষে)। বল্ বেটা কি হয়েছিল, সত্যি করে এখনি বল্।

বেচা। ওগো, না গো, আর বেহালা ধরো না। ও টাকা আমিই দিয়েছি—দিয়েছি।

বিচারক। তুই এত টাকা কোথা পেলি, বল্।

বেচা। আমি—আমি—

কেনা। এই বেয়ালা ধরেছি!

বেচা। না না—আমি, হুজুর আমি—কাল রাত্তিরে হুজুর, চুরি করেছিলাম। দোহাই হুজুর।

কেনা। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। দেখলেন ত বেচুবাবু?

বিচারক। একে পঁচিশ বেত মারো।

ঝানু চোর চানু

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল, চানু ভাবল—বিদেশে গিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসে ছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাপু তোমার?'

চানু বলল, 'চাইব আর কি, কিছু খাবার দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই।'

বুড়ি বলল, 'সরে পড় বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারা দিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু। 'সেটা আর বেশি কথা কি? এই ঠান্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে সেইটাই বরং ভাল।'

বুড়ি দেখল সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়ে নি; কি আর করে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখো বুড়ি! তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায় তা হলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পর চানু দেখল ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করল না।

দলের সর্দারটি তখন চানুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু? কি চাও এখানে?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও তা হলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাও-দাও,

তারপর দেখা যাবে এখন কে সর্দার।'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোনরকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার?' একজন একজন করে সকলেই বলল, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'বাস, তা হলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কিনা—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে সে তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরে রাস্তার আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটী দিয়ে কি হবে, আর এক পাটীও থাকলে ভাল হত।'

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর-এক পাটী জুতো দেখে ভাবল, 'আমি কি বোকা, ও পাটীটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তা হলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।' একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না, তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি? গিন্নিকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তা হলে, চুপচাপ গিয়ে আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব—গিন্নি ভাববে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল তখন সেই চোরেরা ত একেবারে অবাক! চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না কি করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পার।' ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, দেখি আমি পারি কি না, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে. মোড়ের কাছেই এসে দেখে গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া

দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা করো বাবা! খানিক আগে ত এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাই নি!' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল আর-একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম—এ হল কি? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায় নি ত?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কি সর্বনাশ! রাস্তার আর-একটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে! পর পর তিন-তিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হল—'নাঃ, এ কখনই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনো গাছে ঝুলছে কি না।' কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে তখন ডালের মড়া চট করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল মড়া-টরা কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হল তা বুঝতেই পার! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল—'হায়, হায়! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন গিন্নি কি বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল, ছাগল ভেড়া দুটোই গেল; এখন করি কি? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই, সেটাই গিয়ে নিয়ে আসি—গিন্নিও দেখতে পাবে না।'

চান্দ যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরটি বলল, 'আর-একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পার তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত, চান্দ বলল, 'যাও ত, জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার?' কেউ যখন ভরসা পেল না তখন সে বলল, 'আচ্ছা, দেখি, আমি পারি কি না।' চান্দ বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটি খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায় ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেল—কোথা বা ছাগল আর কোথাই বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু কি সর্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলট পালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চান্দ যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চান্দুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত একটা গহবরের

মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি সব দেখিয়ে দিল—চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুণ কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না?'

বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু। 'বটে, কিছু দেয় না। আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনোদিন দেখে নি—মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাঁটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলেই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলে, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায়ই বসে ছিল, তারপর সেই হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।

চানু বলল, 'এ জন্তুগুলো কার বলতে পার কি?'

'এগুলো যে আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায়?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ওগুলিও কি তোমাদের?'

'না মশায়। আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব?'

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই। মোহর-গুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত, বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল তার মা-বাবা বসে আছেন। চানু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি?'

'আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন? আমরা যে বড্ড গরীব।'

চানু আর চুপ থাকতে পারল না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না?'

চানুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথা পেলে বাবা?'

চানু। 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তা হলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে?' এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর

রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চান্দুর বাবার বড্ড ভয় হল। চান্দু তখন সব কথা খুলে বলল—তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চান্দুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চান্দু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদারবাড়ি। বলো গিয়ে আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চান্দুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা! তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

'না! তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ও ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এ-সব কথা বোলো।'

'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ যাচ্ছি, কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চান্দুর বাবা ফিরে এল। চান্দু বলল, কি করে এলে বাবা?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড় অনিচ্ছুক তা ত মনে হল না, বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ—না? যা হোক, জমিদারমশায় বললেন আসছে রবিবারে তাঁরা নাকি একটি হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার, তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কি? দেখা যাবে এখন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা মস্তবড় থলে ঝুলছে, সে এসে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়ে-দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি?'

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো।'

জানালার পাশে একজন লোক বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মস্তবড় একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে—এটাকে মারলে হয় না?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক-পরা চান্দু থলের ভিতর থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু বাবু, খরগোশটা এখনো রয়েছে—এখনো চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকো বলছি।'

খানিক বাদে চান্দু আরো একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে

দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল—আর যায় কোথা! একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই।

জমিদারমশাই বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চান্দ, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।'

একটু পরেই চান্দুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।'

জমিদার বড় চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহংকার ছিল না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চান্দুদের বাড়ি গেলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানারকমের ভাল ভাল খাবার জিনিসের সংগে তাঁর সেই হাঁস ভাজাটিও খেলেন। চান্দুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি ত আগে থেকেই চান্দুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদব-কায়দা দেখে মনে মনে আরো খুশি হল।

খাওয়া দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চান্দ, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার তা হলে দেখা যাবে এখন। ছজন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো।'

চান্দ বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। বেজায় ঠান্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়; তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল—চান্দুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল। রাত যত বেশি হতে লাগল ঠান্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল। এমন সময় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'বাবাসকল, শীতে জমে গেলাম, এক মুঠো খড় দাও ত, আস্তাবলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি, তা না হলে বুড়ো মানুষ—শীতে মরেই যাব।' বুড়ির পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু আংগুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ।

বুড়ি আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম, ঐ কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকব এখন।'

সহিসরা ভাবল, এলই বা বুড়ি বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল—'ও ত আর কোনো অনিষ্ট করবে না।' আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ি বেশ

আরামে বসল। সহিসেরা দেখল বুড়ি খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল—তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করেছে। সহিসদের বুড়ি বলল, 'বাবা, তোমাদের সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে। তবে কি'না তোমরা পাছে কিছু মনে কর তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।' একে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল—'সে কি বুড়িমা, তুমি যদি দাও তা হলে ত বেঁচে যাই—ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।'

বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না। শয়তান বুড়ি তখন আর-একটি বোতল বের করে তাদের দিল। এ বোতলটার মদের সঙ্গে কি মেশানো ছিল, খাবা মাত্র সব কটা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ি উঠে সব কটা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কি দেখলেন? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, 'গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিল সে বেচারারাও গোল্লায় যাক।' আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়কে বেগ পেতে হয়েছিল।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ। এতে তেমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব, নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে! তা হলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

চানু মাথা নিচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে করে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন, তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—'কর্তা শিগ্‌গির বাড়ি যান, মা ঠাকরুনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না; সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। বোধ করি হাত-পা সব ভেঙে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা, কি সর্বনাশ।

ডাক্তারের বাড়ি যে ঢের দূর—তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট শিগ্‌গির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটল।

জমিদারমশাই হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। বাড়ি এসে দেখলেন সাড়া শব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন। ততক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হল। তিনি বুঝতে পারলেন এ-সব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তার চাকরি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত, জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যা হোক আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানার থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু এবারেও যদি ফাঁকি দেন তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন, দিব্যি জ্যোৎস্না, কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশায় দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল; তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন—'দেখলে ত? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি বেটাকে এখনি চমকে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখেই জমিদার গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কর কি, চানুকে গুলি করবে না কি?'

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি—শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছেড়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন ধপ করে কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।

জমিদার গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর নাহয় জন্মের মত খোঁড়া কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদার মশায় কেমন জানি থতমত খেয়ে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন—দরজা খোলাই পড়ে রইল।

জমিদার মশায় বোধ করি তখনো বাইরের জানালার কাছে পৌঁছান নি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'শিগগির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরে নি বোধ হয়, কিন্তু বেজায় রক্ত

পড়ছে—একটু পরিষ্কার করে বেঁধে ঠেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদার মশায় আবার ছুটলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত—সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগে মেগে বলতে লাগলেন—'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসি দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন—'বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!'

'ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে এনে জানালায় ধরেছিল।'

'কী ছাই মাথা মুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর চেয়ে নিয়ে গেলে কেন?'

'বিছানার চাদর—বলছ কি! আমি ত বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসি নি।'

'চাদর চাইতে আস আর না আস আমি সে-সব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।'

গিন্নির কথা শুনে জমিদার মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—'কি ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।'

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চানু খুব ভাল হয়ে গেল—তার মত জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদার মশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন আর লোকের কাছে বলেন—'আমার ঝানু চোর চানু।'

ছোট ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাহাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল; তাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে আর তাদের বলে না, এই জন্য রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভাল ভাল কাপড়গুলো সব তারা ছ'জনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশি ভালবাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন তখন ধরে ঠ্যাঙাত। বেচারাকে এক দণ্ডও সুখে

থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে, ররংগা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বলল, 'চল্, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মত সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের দেখলেই নিশ্চয় সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।'

তখন ত তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছ'জনের প্রত্যেকে ভাবল, 'ররংগা নিশ্চয়ই আমাকেই বিয়ে করবে। কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছ'টি পুঁটলির ভিতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত বড় পানসি তাদের জন্য তয়ের হল। ছ'ভাই মিলে আজ কতরকম করেই পোশাক পরেছে আর চুল আঁচড়েছে; একটু পরে পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোরা রুরুকে সংগে নিবি না?' অমনি তারা ছ'জন একসংগে বলল, 'নেব বইকি। নইলে আমাদের রান্না কে করবে? ররংগাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, এ কথা জানলে লোকে কি বলবে?'

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিছু বলল না। সেও তার দাদাদের সংগে সেই পানসি চড়ে ররংগাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পৌঁছিবামাত্রই এসে রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ি ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছ'ভাই হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে তাদের সংগে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, 'আমাদের জন্য একটি বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।'

তারপর তাদের খাওয়া দাওয়া। আমোদ-আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোনটি যে ররংগা, ছ'ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্‌টি ররংগা?' সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বলল, 'আমিই ররংগা, কাউকে বোলো না।'

এ কথা শুনে ত আর ভাইদের আনন্দের সীমাই রইল না। অত সহজে ররংগাকে পেয়ে যাবে, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তখনই সেই মেয়েগুলোর সংগে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররংগাকে বিয়ে করেছে। ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হল না।

রুরু বেচারা এত কথার কিছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই বা কি? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তা ত সে আর জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে

জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব?' মেয়েটি বলল, 'ঐ যে ররংগার বাড়ি, তারই পাশে ঝরনা আছে।'

রুরু সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, 'ররংগা ত ভোজে গিয়েছে; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়িটি কেমন।' এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররংগা বসে আছে! নিশ্চয় সে ররংগা নইলে এত সুন্দর আর কে হবে?

ররংগা তাকে দেখেই ভারি খুশি হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এসো. এসো, ঘরে এসো।' রুরু জড়সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররংগা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে?' রুরু বলল, 'সেই যে ছ'জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই।' ররংগা বলল, 'তুমি কেন তবে ভোজে যাও নি?' রুরু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায় নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নেই। এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুরুকে দেখেই ররংগার যার পর নাই ভাল লেগেছিল. তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হল। সে বুঝতে পারল যে রুরুর দাদারা বড় দুষ্টু, তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুরুকে তার আরো ভাল লাগল। দুদিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তার পরদিন রুরুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুরু যে তার আগেই ররংগাকে নিয়ে নৌকার তলায় লুকিয়ে রেখেছে; সে কথা তাদের কেউ টের পায় নি। তারা ভারি ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখো মা, ররংগাকে বিয়ে করে এনেছি!' অমনি তার ছোট ভাই তার চেয়ে বেশি করে চেঁচিয়ে বলল. 'না মা, ও মিছে কথা বলছে আমি ররংগাকে এনেছি।'

তখন ত ভারি মজা হল। সবাই বলছে. 'ওদের কথা মিথ্যে, আমি ররংগাকে এনেছি।'

ভয়ানক চটাচটি, মারামারি হয় হয়। বউ কটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তারা ভাবে নি যে অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররংগা ত ছটি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছ।' রুরু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, মার কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক বলেছ মা. ঠকে এসেছে। আমার সংগে এসো, আমি ররংগাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথায় রুরুর দাদারা ত হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল; কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুরুর সংগে নৌকোয় এলেন, আর একটিবার ররংগার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছেয়ে ফেলল। তখন পাড়ার ছেলে বুড়ো, গিন্নি বউ সকলে ছুটে এসে ররংগাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ-সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'বটে? ফাঁকি দিয়েছিস?' শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ করো! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।'

কাজির বিচার

রামকানাই ভাল মানুষ—নেহাত গোবেচারা। কিন্তু ঝুটারাম লোকটি বেজায় ফন্দিবাজ। দুইজনে দেখা-শোনা আলাপ-সালাপ হল। ঝুটারাম বললে, 'ভাই, দুজনেই বোঝা বয়ে খামকা কষ্ট পাই কেন? এই নাও, আমার পুঁটলিটাও তোমায় দিই—এখন তুমি সব বয়ে নাও—ফিরবার সময় আমি বইব।' রামকানাই ভালমানুষের মত দুজনের বোঝা ঘাড়ে বয়ে চলল।

গ্রামের কাছে এসে তাদের খুব খিদে পেয়েছে: রামকানাই বলল, 'এখন খাওয়া যাক—কী বল?' ঝুটারাম বলল, 'বেশ ত, এক কাজ করো, খাবারের হাঁড়ি দুটোই খুলে কাজ নেই—মিছামিছি দুটোই নষ্ট হবে কেন? এখন তোমারটা থেকে খাওয়া যাক—ফিরবার সময় আমার খাবারটা খাওয়া যাবে।' রামকানাই তাই করল। ঝুটারাম বলল, 'ভাই তোমার বাড়ি কে কে আছে?' রামকানাই তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলেপিলে সকলের কথা বলতে লাগল—তার মেয়ে কত বড় হয়েছে—তার ছেলে কি করে—সব কথা বলল। রামকানাই যত কথা বলে, ঝুটারাম ততই আরো প্রশ্ন করে, আর গপাগপ ভাত মুখে দেয়। রামকানাই গল্পেই মত্ত, তার যখন হুঁশ হল—ততক্ষণে খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—।

ঝুটারাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'ভাই একটি কথা। তুমি যে আমায় খাওয়ালে সে এমন বিশ্রী রান্না, যে কি বলব! তুমি এমন খারাপ লোক তা আমি জানতাম না, নেহাত তুমি বন্ধু লোক, তোমায় আর বেশি কি বলব; কিন্তু এরপর আর তোমার সঙ্গে আমার ভাব রাখা চলে না। আমি চললাম।' এই বলে সে ভরা হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হন হন করে চলে গেল। রামকানাই বেচারার পেটও ভরে নি—ঝুটারামের ভাগ থেকে যে খাবার আশা ছিল তাও গেল। সন্ধ্যার সময় পেটে খিদে নিয়ে এতখানি পথ হেঁটে কি করে সে বাড়ি ফিরবে—তাই ভেবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কাজির পেয়াদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রামকানাইকে বললে, 'কাঁদ কেন?' রামকানাই তাকে সব কথা বলল। পেয়াদা বলল, 'এই কথা। চলো দেখি, কাজি সাহেবের কাছে। তিনি এর বিচার করবেন।' কাজির কাছে হাজির হতেই হুজুর বললেন, 'কী চাও?' রামকানাই তাঁকেও সব শোনাল। কাজি শুনে বললেন, 'হাঃ—হাঃ—হাঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ এমন মজা ত কখনো শুনি নি! আরে, তোকে দিয়ে জিনিস বইয়ে, আবার তোরই ভাত খেয়ে গেল? তোর আক্কেল ছিল কোথায়? হাঃ—হাঃ—হাঃ—বোলাও ঝুটারামকো!' পেয়াদা

ছুটল, লোকলস্কর সবাই ছুটল—তিন মিনিটের মধ্যে ঝুটারামের ঝুঁটি ধরে কাজির সামনে দাঁড় করাল।

কাজি বললেন, 'আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও! গাঁয়ের মোড়লকে ডাকো, শেঠজীকে ডাকো, কোটাল বদ্যি গুরুমশাই—ঢাক পিটিয়ে সবাইকে ডাকো, এমন মজার কথাটা সবাই এসে শুনে যাক।' দেখতে দেখতে ঘর ভরিয়ে ভিড় জমিয়ে লোকের দল হাজির হল। তখন কাজি বললেন, 'বাবা ঝুটারাম, এবার তুমি বলো দেখি, তোমাতে আর এঁতে কি হয়েছিল?' ঝুটারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমি কিছু জানি না। ঐ হতভাগা আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে খানিকটা খাবার খাইয়েছিল—সেই থেকে আমার মাথা ঘুরছে আর কেমন করছে।'

এই কথা শুনে রেগে চিৎকার করে কাজি বললেন, 'পাজি, আমার মজার গল্পটা মাটি করলি। খাবার খেলি আর মাথা ঘুরল. এ কি একটা কথা হল? পেয়াদা, দেখ ত ওর কাছে কি আছে। সব কেড়ে রাখ। ব্যাটার গল্পের মধ্যে যদি একটু রস থাকে। ও-সব ঐ রামকানাইকে দিয়ে দে। ও যা বলছে, সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, তার মধ্যে মজা আছে। আরে—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ।

সাতমার পালোয়ান

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। কিন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসী গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহনত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং মোটের উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল. 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কি না।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি আসিয়া তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, রোসো!' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমনি এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে মাছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি

বগলে করিয়া ভারি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো গম্ভীর হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ্, হিসেব করে কথা কোস। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

কানাই আর কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস?'

শেষে একদিন কানাই এক থান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া, জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি হে?' কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কি করতে? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হুকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই ত! ডাক্ পালোয়ানকে!'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।'

ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায়! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায়! কানাই বলিল, 'এখন আর কি? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইল, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর-এক হাতে ডান্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল, সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া হইত।

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি—এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।' নাতনী বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।'

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ি তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় করবে! সেটা না জানি তবে কেমন ভয়ংকর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হলেই ত মুশকিল দেখছি।"

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই ত একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, তারপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া লইয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কি করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, এর কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল।

তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কি না। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর-এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই। তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল।

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুর-মতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে

টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে—বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে, 'ভাই, ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেই-সব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহূর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে, বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ ত মন্দ নয়! পালাতে চেয়েছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধ জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন ত সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

কুঁজো আর ভূত

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ংকর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালমানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল: আর কোনো ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড় দুষ্টু লোক; তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারি বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে আসতে চায় না, বলে, ওটা ভূতের

বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই! কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করে?

কতক্ষণ সে এভাবে বসে ছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন সেই পুরনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য কিন্তু কথা খালি এইটুকু

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!'

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল, সে ভাবল যে তারও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।

এইটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল : 'লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁট্‌কি হ্যায়।'

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল—সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুশি হল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল : 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়।

লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁট্‌কি হ্যায়।'

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন হঠাৎ তার মনে হল, 'কি আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কি করে?' বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল—এ কি? তার সে কুঁজ যে আর নেই! একজন ভূত বলল, 'কি, দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই, ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে!'

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না. সেটা তার পাশে পড়ে ছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কি আনন্দই হল! আর হালকা আর আরাম বোধ হল এমনি, যে সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে; ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নতুন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে, মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, এ কথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

যে শুনল, সেই ভাবল যে, এমন আশ্চর্য কথা আর কখনো শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগা, কেবলহাটি যাব কোন্ পথে?' কানাই বললে, 'এই ত কেবলহাটি; তুমি কি চাও?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

কানাই বলল, 'আমিই ত সেই কানাই, ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম; তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কথা কানাইয়ের কাছে থেকে জেনে নিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্টু আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এনে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে যাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছে : 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচা-গোল্লা হ্যায়।'

তখন গানের তাল ভেঙে ত গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এ-সব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিঁচুতে এসে বলল, 'কে রে তুই, অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপরে বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হল কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

জাপানী দেবতা

জাপান দেশে 'কোজিকী' বলে একখানা পুরনো পুঁথি আছে। তাতে লেখা আছে যে, পৃথিবীটা যখন হয়েছিল তখন সেটা তেলের মত পাতলা ছিল, আর ফেনার মত সমুদ্রে ভেসে বেড়াত।

তখন নাকি মোটে তিনটি দেবতা ছিলেন। এই তিনটি মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি হলেন; তাঁরা মরে গেলে আর দুটি—তাঁরা মারা গেলে আবার দশটি দেবতা হলেন।

এই দশটি দেবতার একজন ছিলেন 'ইজানাগী'; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল 'ইজানামী'।

অন্য দেবতারা এঁদের দুজনের হাতে একটা শূল দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই তেলের মতন জিনিসটা থেকে পৃথিবী তয়ের করো।'

ইজানাগী আর ইজানামী বললেন, 'আচ্ছা।' বলে তাঁরা সেই শূল দিয়ে সমুদ্রটাকে ঘাঁটতে লাগলেন। তারপর যখন শূল তুললেন, তখন তার মুখ বেয়ে যে জল পড়েছিল, তাই থেকে একটা দ্বীপ হল, তার নাম 'ওনগরো'। এই ওনগরো দ্বীপে একটি সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, তার ভিতরে ইজানাগী আর ইজানামী বাস করতে লাগলেন। সেইখান থেকেই তাঁরা জাপান দেশটাকে গড়েছিলেন। এই দেশকে আমরা বলি 'জাপান', কিন্তু সে দেশের লোকেরা বলে 'নিপ্পন্' বা 'দাই-নিপ্পন্'।

ইজানাগী আর ইজানামীর অনেক ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে 'আগুন-দেবতা' একজন। এই দেবতার জন্মের সময় ইজানামী মরে গেলেন। তখন মনের দুঃখে ইজানাগী চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর সেই চোখের জল থেকে 'কান্না-পরীর' জন্ম হল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে ইজানাগীর রাগ হল। তখন তিনি তলোয়ার দিয়ে আগুন-দেবতার মাথা কেটে ফেললেন, তাতে সেই কাটা দেবতার শরীর আর রক্ত হতে ষোলটা দেবতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু ইজানাগীর মনের দুঃখ তাতেও ঘুচল না। শেষে তিনি ইজানামীকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পাতালে উপস্থিত হলেন—সেই যেখানে মৃত্যুর পরে সকলকেই যেতে হয়। পাতালের ভিতর মস্ত পুরী আছে, সেই পুরীর দরজায় গিয়ে ইজানামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ইজানামী তাঁকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও আমি জিজ্ঞাসা করে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে যাব।' এই বলে ইজানামী ভিতরে গেলেন। ইজানাগী খানিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষে ইজানামীর দেরি দেখে তিনিও ভিতরে গেলেন। ভিতরে যেতেই এমনি ভয়ানক গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগল যে কি বলব। এমন ভয়ংকর নোংরা জায়গার কথা কেউ ভাবতেও পারে না; আর সেখানে থেকে থেকে ইজানামীও এমন নোংরা হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যাবার সাধ্য নাই। এ-সব দেখে ইজানাগী নাকে হাত দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালেন। পেয়াদাগুলো তাঁকে পালাতে দেখে 'ধর ধর' বলে তাড়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারে নি।

কি বিষম গন্ধই সে জায়গার ছিল; দেশে ফিরেও ইজানাগীর গা থেকে সে গন্ধ গেল না। গন্ধে অস্থির হয়ে তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁর কাপড় আর গা থেকে অনেকগুলি দেবতা বেরিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে একটি মেয়ে ইজানাগীর বাম চোখ দিয়ে বেরিয়েছিলেন, সেটি এমন সুন্দর যে, তেমন আর কেউ কখনো দেখে নি। সেই মেয়েটির নাম 'গগন-আলো', তিনি সূর্যের দেবতা!

ইজানাগীর ডান চোখ দিয়ে আর-একটি সুন্দর দেবতা বেরিয়েছিলেন, সেটির নাম 'তেজবীর'।

তখন ইজানাগী তাঁর নিজের গলার হার গগন-আলোর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, তুমি হলে স্বর্গের রানী।'

চন্দ্রপতিকে তিনি বললেন, 'তুমি হলে রাত্রির রাজা।' আর তেজবীরকে বললেন, 'তুমি হলে সমুদ্রের রাজা।' তখন গগন-আলো গিয়ে স্বর্গের রানী হলেন, চন্দ্রপতি গিয়ে রাত্রির রাজা হলেন। কিন্তু তেজবীর সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলেন। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই গালে হাত দিয়ে কান্না। তাঁর দাড়ি লম্বা হয়ে ভুঁড়িতে গিয়ে ঠেকল, তবুও তাঁর কান্না থামল না।

ইজানাগী বললেন, 'আরে তোর হল কি? রাজ্য দিলাম, রাজ্যে গেলি না, খালি যে কাঁদছিস্?'

তেজবীর বললেন, 'আমি রাজ্য চাই না। আমি সেই পাতালে আমার মার কাছে যাব।'

ইজানাগী বললেন, 'তবে যা বেটা তুই এখান থেকে দূর হয়ে।' বলে তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন তেজবীর স্বর্গে গিয়ে গগন-আলোর কাছে উপস্থিত হলেন। গগন-আলো জানতেন, তাঁর মন ভাল নয়, কাজেই তিনি তাঁকে দেখে ভাবলেন, 'না-জানি কেন এসেছে!'

তেজবীর কিন্তু বললেন, 'বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই মার কাছে চলেছি। যাবার আগে তোমাকে দেখতে এলাম।'

গগন-আলো বললে, 'তাই যদি হয়, তবে তোমার তলোয়ারখানা দাও ত।'

তেজবীরের কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে গগন-আলো সেটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। সেই গুঁড়ো থেকে তিনটি দেবতা জন্মাল।

তখন তেজবীর বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার গহনাগুলি দাও ত।' গহনা নিয়ে তিনি চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন, আর সেই গুঁড়ো থেকে পাঁচটি দেবতা হল।

এখন, এই যে সব দেবতা হল, এরা কার? গগন-আলো বললেন, 'তোমার তলোয়ার থেকে যারা হয়েছে, তারা তোমার, আর আমার গহনা থেকে য়ারা হয়েছে, তারা আমার।'

কথাটা ত বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হলে কি হয়, গগন-আলোর গহনা থেকেই যে বেশি দেবতা হয়েছিল কাজেই সে কথা তেজবীরের পছন্দ হল না।

তাতে তিনি বিষম চটে গিয়ে গগন-আলোর ক্ষেত মাড়িয়ে, খাল বুজিয়ে, বাগান ভেঙে, বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলেন।

পর্বতের গুহার ভিতরে নিজের ঘরে বসে সখীদের নিয়ে গগন-আলো কাপড় বুনছিলেন, সেই ঘরের ছাত ভেঙে তেজবীর ভিতরে ছাল-ছাড়ানো মরা ঘোড়া ফেলে দিলেন।

কাজেই তখন আর গগন-আলো কি করেন, তিনি তেজবীরের ভয়ে গুহার দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন, তিনিই হলেন সূর্যের দেবতা, আলোর মালিক, সেই আলোর মালিক যখন গুহায় লুকোতে গেলেন, তখন কাজেই জগৎ-সংসার অন্ধকার হয়ে গেল।

সকলে বলল, 'সর্বনাশ! এখন উপায়?' তখন তারা করল কি, তারা সবাই মিলে অনেক যুক্তি করে একখানা চমৎকার আরশি তয়ের করল, আর যার পর নাই সুন্দর একছড়া মণির মালা গড়াল, আরো কত কি জিনিস খুঁজে নিয়ে এল। সেই-সব জিনিস আর সেই আরশি আর সেই মালা দিয়ে গগন-আলোর পূজা করে, তারপর তারা হেসে, গেয়ে নেচে, লাফিয়ে চেঁচিয়ে, মোরগ ডাকিয়ে, কি যে একটা শোরগোল জুড়ে দিল, তা না শুনলে বোঝা যায় না।

গুহার ভিতর থেকে সেই গোলমাল শুনে গগন-আলো ভাবলেন, 'না জানি কি হয়েছে।' তিনি আস্তে আস্তে গুহার দরজা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে তোরা কিসের এত গোলমাল করছিস?'

তারা বলল, 'গোলমাল করব না? দেখো এসে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর একটি মেয়ে পেয়েছি!' বলেই সেই আরশিখানা এনে তাঁর সামনে ধরল।

সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখে আর সূর্যের দেবতা লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি ছুটে বেরিয়ে এলেন—আর অমনি সকলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল।

তখন আবার সূর্য উঠল, আবার আলো হল, আবার সংসারে সুখ এল। তারপর সবাই মিলে সেই দুষ্ট তেজবীরকে দূর করে তাড়িয়ে দিল।

সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, তেজবীর ঘুরতে ঘুরতে হী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানে দুটি বুড়োবুড়ি একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে বসে কাঁদছিল, তাদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

বুড়োটি বলল, 'বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনে কি করবে? আমার আটটি মেয়ে ছিল, তার সাতটি অজগরে খেয়েছে, এই একটি আছে। সে বড় ভয়ংকর অজগর, তার আটটি মাথা। বছরে একবার করে আসে, আর আমার একটি মেয়েকে খেয়ে যায়। আবার তার আসবার সময় হয়েছে, এবারে এটিকেও খাবে। তাই আমরা কাঁদছি।'

তেজবীর বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। আমি যা বলছি, তাই করো। আট জালা খুব কড়ারকমের সাকী (জাপানী মদ) তয়ের করো ত। করে, ঐ জায়গায় রেখে দাও, তারপর দেখো কি হয়।'

বুড়ো সেইদিনই আট জালা সাকী তয়ের করে তেজবীরের কথামত সাজিয়ে রেখে দিল; সাকীর গন্ধে চারিদিক ভুর ভুর করতে লাগল। ঠিক সেই সময় অজগর গড়াতে গড়াতে আর ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর, সকলের আগে সেই সাকীর গন্ধ গিয়েছে তার নাকে। আর কি সে বেটা তার লোভ সামলাতে পারে? সে অমনি আট জালায় আট মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে সাকী খেতে লাগল। খেতে খেতে তার চোখ বুঁজে এল, মাথা ঢুলে পড়ল; তবু হুঁশ নাই, সে চোঁ চোঁ করে খাচ্ছে। শেষে ঘুমে অচেতন হয়ে একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তা দেখে তেজবীর বললেন, 'আর—কি? এই বেলা!' বলেই তিনি তাঁর তলোয়ার নিয়ে এসে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন। তার লেজটা কিন্তু ভারি শক্ত ঠেকল। কিছুতেই কাটা গেল না, বরং তাঁর তলোয়ারই ভেঙে গেল। তখন তেজবীর খুঁজে দেখলেন যে সেই লেজের ভিতরে আশ্চর্য রকমের একখানা তলোয়ার রয়েছে। তিনি তখনি সেই তলোয়ারখানা বার করে নিলেন।

তখন ত সকলেরই খুব সুখ হল। তারপর বুড়োর মেয়েকে বিয়ে করে, সেই দেশে সুন্দর বাড়ি তয়ের করে, দুজনে সুখে বাস করতে লাগলেন। আর সেই বাড়িতে যার পর নাই আদর যত্নে থেকে বুড়োবুড়িরও শেষকাল খুব আরামেই কাটল।

গগন-আলোর যে নাতি, তাঁর ছিল তিন ছেলে; দীপ্তানল, ক্ষিপ্তানল আর তৃপ্তানল।

দীপ্তানল মাছ ধরেন আর তৃপ্তানল শিকার করেন। একদিন তৃপ্তানল দীপ্তানলকে বললেন, 'দাদা, চলো না, তোমার কাজটি আমি করি, আর আমার কাজটা তুমি করো—দেখি কেমন হয়।' বলে, নিজের তীরধনুক দাদাকে দিয়ে, দাদার বঁড়শি আর ছিপ তিনি চেয়ে নিলেন। নিয়ে মাছ ত ধরলেন খুবই, লাভের মধ্যে বঁড়শিটা মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন দীপ্তানল বললেন, 'ভাই, শখ কি মিটেছে? এখন কেন আমার বঁড়শি আর আমাকে ফিরিয়ে দাও না।' তাতে তৃপ্তানল ভারি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'দাদা, বঁড়শি ত মাছে নিয়ে গেছে এখন কি করে দিই?' এ কথায় দীপ্তানল যার পর নাই রেগে বললেন, 'সে আমি জানি না; আমার বঁড়শি আমাকে এনে দাও।'

তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, নিজের তলোয়ারখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাই দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে দাদাকে দিলেন। কিন্তু দাদার তাতে মন উঠল না; তিনি বললেন, 'ও আমি চাই না; আমার বঁড়শি নিয়েছ তাই এনে আমাকে দাও।'

তৃপ্তানল হাজার বঁড়শি এনে দীপ্তানলকে দিতে গেলেন, তাতেও হল না। দীপ্তানল আরো রেগে গিয়ে বললেন, 'আমার সেই বঁড়শিটি আমাকে এনে দিতে হবে।' তা শুনে তৃপ্তানল মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। ভাবলেন, 'হায় হায়! এখন আমি কি

করি? সমুদ্রের মাছে বঁড়শি নিয়ে গেছে, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?

এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে কাঁদছেন, এমন সময় সমুদ্রের দেবতা লবণেশ্বর সেইখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি হয়েছে বাছা? তুমি কাঁদছ কেন?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেটা মাছে নিয়ে গেছে। তাতে দাদা বড্ড রাগ করেছেন। আমি আরো কত কাঁটা তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি নিলেন না, বললেন, আমার সেইটে এনে দাও। এখন আমি কি করি?' লবণেশ্বর বললেন, 'তুমি কেঁদো না, আমি যা বলছি তাই করো।' বলে, তিনি তখনি একখানা নৌকা তয়ের করে তৃপ্তানলকে তাতে বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'এই নৌকায় চড়ে তুমি এই এই পথ দিয়ে যেতে থাকবে। খানিক দূর গিয়ে মাছের আঁশ দিয়ে গড়া একটা বাড়ি দেখতে পাবে, সেইখানে সমুদ্রের রাজা সিন্ধুপতি থাকেন। সেই বাড়ির পাশে, বাগানের ভিতরে, কুয়োর ধারে একটা গাছ আছে, তার আগায় উঠে তুমি বসে থাকবে। সেই বাগানে রাজার মেয়ে বেড়াতে আসে, সে তোমাকে তোমার বঁড়শির কথা বলে দেবে।'

এ কথায় তৃপ্তানল সেই নৌকা বেয়ে, সেই রাজার বাড়িতে গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইলেন। খানিক বাদে রাজার মেয়ের দাসীরা কলসী হাতে করে সেই কুয়ো থেকে জল নিতে এল। এসে তারা দেখল যে গাছের উপরে কেমন সুন্দর একটি রাজপুত্র বসে আছে। তৃপ্তানল তাদের বললেন, 'হ্যাঁ গা, তোমরা দয়া করে আমাকে একটু জল খেতে দেবে?' দাসীরা অমনি সোনার গেলাসে জল এনে তাঁকে খেতে দিল। তিনি তা থেকে একটুখানি জল খেলেন। তারপর গেলাস ফিরিয়ে দেবার সময়ে নিজের গলা থেকে মণি খুলে তার ভিতর ফেলে দিলেন। দাসীরা তা দেখতে পায় নি, তারা সেই মণিসুদ্ধ গেলাস নিয়ে রাজার মেয়ের ঘরে রেখে দিয়েছে।

তারপর রাজার মেয়ে জল খাবার জন্য গেলাস খুঁজতে এসে বললেন—'এ কি? গেলাসের ভিতর মণি কোত্থেকে এল রে?' দাসীরা বলল, 'তা ত আমরা জানি না, কুয়োর ধারে একটি রাজপুত্র বসে আছে। সে আমাদের কাছে জল খেতে চাইল, আমরা এই গেলাসে করে নিয়ে তাকে জল খেতে দিলাম। মণি হয়ত তারই হবে।'

রাজার মেয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। রাজা সিন্ধুপতিও এ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি সেই কুয়োর ধারে চলে এলেন। এসে সেই গাছের উপরে তৃপ্তানলকে দেখেই তিনি যার পর নাই আশ্চর্য আর খুশি হয়ে বললেন, 'আরে তোমার নাম না তৃপ্তানল? আমাদের স্বর্গের রানী গগন-আলোর নাতির ছেলে! তুমি কেন কুয়োর ধারে বসে থাকবে বাবা? এসো এসো, ঘরে এসো!' বলে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে রাজা তাঁকে সভায় নিয়ে এলেন। সভার লোক তাঁর নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁকে সেলাম করে জোড়হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাজা অনেক ধুমধাম করে তাঁর সংগে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে বেশ সুখেই দিন যায়। রাজা রোজই খবর নেন, তৃপ্তানল

কেমন আছেন, রাজার মেয়ে বলেন, 'বেশ ভাল আছেন।' এমন করে তিন বৎসর চলে গেল। তারপর একদিন রাজা খবর নিতে এসে শুনলেন যে, তৃপ্তানল বিছানায় শুয়ে একটা খুব লম্বা নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অমনি রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কেন নিশ্বাস ফেলেছিলে? তোমার কিসের দুঃখ?' তৃপ্তানল বললেন, 'দাদার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলাম, সেই বঁড়শি মাছে নিয়ে গেছে। এতে দাদার বড্ড রাগ হয়েছে, আর বলেছেন যে, সেই বঁড়শি তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে কিছুতেই হবে না।' শুনে রাজা বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা—ডাক্ ত রে সকল মাছকে!' রাজার হুকুমে পৃথিবীর যত মাছ সকলে এসে তাঁর কাছে হাজির হল, আর রাজা তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো ত, তোমাদের কার গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল?' তারা সকলে বললে, 'তাই মাছের গলায় সেই বঁড়শি আটকেছিল। আজও তার খোঁচা লাগে।' তখন রাজামশায় তাকে বললেন, 'হাঁ কর্ ব্যাটা, দেখি তোর গলায় কি আছে!' এ কথায় তাই যেই 'অ-অ-অ-আ-ক্!' করে দুহাত চওড়া হাঁটি করেছে, অমনি দেখা গেল যে ঠিক সেই বঁড়শিটি তার গলায় বিঁধে রয়েছে। অমনি চিমটা দিয়ে সেটাকে বার করে আনা হল। তখন ত আর তৃপ্তানলের আনন্দের সীমাই রইল না। রাজামশাই তাঁর হাতে সেই বঁড়শিটি দিয়ে আরো দুটি মাণিক তাঁকে দিলেন! তার একটির নাম জোয়ার-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সমুদ্র ছুটে এসে শত্রুকে ডুবিয়ে দেয়। আর একটির নাম ভাটা-মাণিক; তাকে ছুঁড়ে মারলে সেই সমুদ্র ফিরে চলে যায়।

তারপর কুমিরের রাজাকে ডেকে সিন্ধুপতি বললেন, 'তুমি তৃপ্তানলকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। দেখো যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়।'

সেই পাহাড়ের মত কুমির তৃপ্তানলকে পিঠে করে তাঁর দেশে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর দীপ্তানলকে তাঁর বঁড়শি ফিরিয়ে দিতে আর বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু দীপ্তানল কোথায় তাঁর বঁড়শি পেয়ে খুশি হবেন, না তিনি আরো রেগে তলোয়ার নিয়ে তৃপ্তানলকে কাটতে গেলেন। তখন তৃপ্তানল আর কি করেন, তাড়াতাড়ি সেই জোয়ার-মাণিককে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই ত সমুদ্রের জল পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে এসে দীপ্তানলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তখন আর তিনি যাবেন কোথায়? ঢকঢক জল খেতে খেতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'রক্ষে করো ভাই! আমার ঘাট হয়েছে. আমি—আর অমন করব না।' সে কথায় তৃপ্তানল ভাটা-মাণিক ছুঁড়ে জল সরিয়ে তাঁকে বাঁচালেন।

তারপর থেকে দীপ্তানল ভালমানুষ হয়ে গেলেন, আর ছোট ভাইকেই রাজ্য ছেড়ে দিলেন।